বৈশাখী

শ্রীযোগজীবন বসু বি, এ,

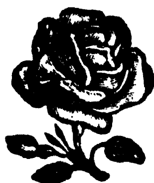
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

১৯২৬

মূল্য আট আনা।

Published by
THE AUTHOR FROM
Rajanagar, Dacca.



Printed by M. C. Das
at the FINE ART PRINTERY,
14, College Square, Calcutta.

উপহার

কর্ম্মের পথে।



"—বেলা, খেয়েছিস্?"

"—হাঁ মা, আমি এইত খেয়ে এলাম। তুমি কেমন আছ মা, এখন?"

"—মা বেলা আমি ত আর মা বাঁচব না, আমার জন্য কি তোদের খুব কষ্ট হবে? কি করব মা আমার যে দিন ফুরিয়ে এসেছে।"

'—মা, তুমি অমন করছ কেন? তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া—"হাঁ, মা, কষ্ট বৈকি! তোরা দুটী বোন্, আমায় ছেড়ে কেমন করে থাকবি?"

বেলা কাঁদিয়া ফেলিল।

"—কাঁদিস্ নি বেলা, তোদের চোখের জল ত আমি সইতে পারি না: বেলা, মিনিকে খুব ভালবাসিস্; আদর যত্ন করিস্। তুই ত মা, আমার, অবুঝ না এখন। মিনিকে তোর হাতে সঁপে গেলাম। আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি তোদের অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। বাইরে ঝড় উঠেছে কি?"

'—না, মা ঝড় উঠেনি ত; তুমি অত উতালা হচ্ছ কেন?

'—ঝড় বাইরে নয়, বেলা, ভিতরে; আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। বেলা—'

—'মা—'

—'আচ্ছা, খুড়ীমা তোদের খুব ভালবাসেন? খুড়ীমার অবাধ্য হোস্ নে কখনো। আমি চলে গেলে খুড়ীমার কাছে থাকতে পারবি ত? খুড়ীমাও তোদের খুব ভালবাসেন, না—?'

—'হাঁ—মা, ভালবাসেন বটে, কিন্তু তোমার মত কে বাস্‌বে মা? মা, তুমি সত্যি বাঁচবে না। চলে যাবে আমাদের ছেড়ে? কোথায় যাবে মা? তোমার ত মা, আমাদের জন্য বড় কষ্ট হবে, মা? মানুষ মরে কোথায় যায় মা?'

—'তা জানি না বাছা, তবে শুনেছি, এজন্মে ভোগবাসনার তৃপ্তি না হলে মানুষের আত্মাকে আবার মাতৃগর্ভে এসে আশ্রয় নিতে হয়। আবার সংসারে আস্‌তে হয়। যতদিন না মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, ততদিন শূন্যে বেড়িয়ে বেড়াতে হয়।'

—'তা হলে মা, তুমি আবার মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মাবে? 'আমাদের মা হবে? তাই ত শুনেছি মা, বাবা একদিন বল্‌ছিলেন যে, মানুষ মরে গেলেও কিছুদিন ভালবাসার জনের কাছে থাকতে পায়।'

—'হাঁ মা, থাক্‌তে পায় বটে, কিন্তু অতি সূক্ষ্মভাবে। মানুষের রক্ত-মাংসের দেহটা নষ্ট হয়ে, পঞ্চভূতে মিশে যায়, কিন্তু আত্মার ত বিনাশ নেই। আর কি জানিস্? আত্মার স্ত্রীপুরুষ ভেদ নেই। একই আত্মা কর্ম্মফল ও বাসনার অনুযায়ী এক জন্মে স্ত্রী আর এক জন্মে পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করতে পারে।'

—'তাইত মা, তুমি যদি না বাঁচ, আমরা কার কাছে থাক্‌ব মা?'

—'কেন, বেলা, উনি রয়েছেন, তোর কাকী মা, কাকা বাবু, মোক্ষদা রয়েছে; কোন কষ্ট হবে না তোদের।'

—'না মা, তুমি না বাঁচলে আমাদের যে বড় কষ্ট হবে মা!

—'কি করব বেলা, আমার এ জীবনের খেলা সাঙ্গ হয়ে এল। আমায় যেন কে ডাক্‌ছে ওপার থেকে। আমাকে যেতে হবে মা—'

—'মা, মা,' বলিয়া মায়ের বুকের উপর মাথা গুঁজিয়া বালিকা অনুচ্চ-স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় মোক্ষদা ঝি গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "দিদিমনি, ছোট বউমা, তোমায় ডাক্‌ছেন।" বেলা চক্ষু মুছিয়া বলিল,

"নাগো' দিদি, আমি এখন যাব না। কাকীমাকে বলগে, আমি আজ রাতে মা'র কাছেই শোব।"

মোক্ষদা এ বাড়ীর অনেক দিনের পুরাতন ঝি। সে এ বাড়ীর ছেলে মেয়েদের হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে। মোক্ষদার বয়স আজও চল্লিশ পার হয় নাই। লম্বা ছিপ্‌ছিপে একটানা চেহারাখানা তাহার; বেশ মায়া মমতায় পরিপূর্ণ। এ বাড়ীর কর্ত্তা মোক্ষদাকে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন। তাহার সত্য পরিচয় সে নিজে কখনও বলিতে পারে নাই। আমরাও সঠিকভাবে বিশেষ কিছু অবগত নহি। এখন সে সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর হাব, ভাব, ভাষা ও চাল-চলন আয়ত্ব করিয়া লইয়াছে। মোক্ষদার উপরই দত্তবাড়ীর ছেলেমেয়েদের মানুষ করিবার ভার; তার পিপাসিত মাতৃবক্ষের সবটুকু সঞ্চিত স্নেহ মমতা দিয়া সে এ পরিবারের ছেলেমেয়েদের লালন পালন করিত। যতদিন দত্ত-মহাশয় ও গৃহিণী জীবিত ছিলেন, সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের ভার মোক্ষদার উপরই ন্যস্ত ছিল। আজ তিন বৎসর তাঁহাদের উভয়ের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদাও সংসারের কাজকর্ম্মের প্রতি একটু উদাসীনা হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, মোক্ষদা বেশ বুঝিতে পারিত যে নবীনা গৃহিণীরা আপনাদের উপর কর্ত্তৃত্ব পাইলে পুরাতন ঝি চাকরের প্রাধান্য সহ্য করাটা মোটেই পছন্দ করেন না; বয়সের বা অভিজ্ঞতার সম্মান করাটা অনেক সময় তাঁহারা অপমানজনক বলিয়া মনে করেন। তাই মোক্ষদা যতটা সম্ভব আপনাকে একটু দূরে রাখিতেই চেষ্টা করিত।

বড় গৃহিণী একটি মৃত শিশুপুত্র প্রসব করার পর হইতে আজ প্রায় তিন মাস যাবৎ সূতিকারোগে শয্যাগতা। তাঁহারই দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা বেলাকে ডাকিতে মোক্ষদা এই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিল। বেলা মাকে ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃতা না হওয়াতে মোক্ষদা সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বালিকা আবার মায়ের বুকে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বেলা মায়ের বড় আদরের সন্তান। জননীও কন্যার মুখে চোখে হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন মাতা-পুত্রী খুব প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইলেন।

মানুষের মনের আবেগ যখন অসহনীয় হইয়া উঠে, তখন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিলেই শুধু সে ভাবের অভিব্যক্তি হয়,—ভাষায় তা হয় না। এক ফোঁটা চোখের জল অন্তরের কত রুদ্ধভাবকে যে মুক্ত করিয়া দেয়, তা যে কাঁদিতে জানে, সে-ই শুধু উপলব্ধি করিয়াছে।

তারপর রাত্রি ক্রমেই গভীর হইয়া আসিল; বেলা মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রোগিনী আর কিছুতেই ঘুমাইতে পারিলেন না, কেবলই ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। মোক্ষদা রাত্রিতে দুই তিনবার আসিয়া রোগিনীর সন্ধান লইয়া যাইত। সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মোক্ষদা অতি সন্তর্পণে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াই যেন চমকিয়া উঠিল। সে একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বলিল,—"বড় বউ মা, তোমার চোখ দুটো যেন ফেটে পড়ছে। তুমি অমন্ করে চেয়ে রয়েছ যে? একটু জল খাবে? মাথায় গোলাপজল দোব?"

—না, আমার সব শেষ হয়ে গেছে লো—বোন্, সব শেষ হয়ে গেছে। আমার বেলা-মিনিকে তোরা দেখিস্। বড় জ্বালা! উঃ———"

—'বড় বাবুকে ডাক্‌ব?'

—'ডাক্ একবার, সকলকেই ডাক্—এ জন্মের শেষ দেখা দেখে নি। মিনিকে নিয়ে আয়! বড় অভিমানিনী——মিনি আমার!'

বেলা জাগিয়া উঠিয়া আবার কাঁদিতে বসিয়াছে। সুরেশ্বর বাবু মিনিকে লইয়া রোগিণীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শশিশেখরকে ডাক্তারের জন্য প্রেরণ করিলেন।

রোগিণীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেরই খুব আশঙ্কা হইল। ডাক্তারবাবু আসিয়া যথাসম্ভব পরীক্ষার পর বলিলেন যে স্নায়ুবিক

দৌর্ব্বল্য অত্যন্ত প্রবল; যে কোন মুহূর্ত্তে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

হায়, কত সাধের সংসার! কত আলাপ পরিচয়! কত স্নেহ মমতার বন্ধন। এক মুহূর্ত্তে মানুষ সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া কোন্ অজানা, অচেনা দেশে চলিয়া যায়।

রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়। সারাটা বিশ্ব নিঝুম, নীরব। শরতের উদার আকাশ, পূর্ণিমা-রাত্রের জ্যোৎস্নায় ভরপুর। অসংখ্য নক্ষত্র মিট্ মিট্ করিয়া যেন সুদূরের কোন্ নবীন অতিথিকে তাহাদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছিল।

তারপর প্রভাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বেলার আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিল. "মা,—মা,—ওমা,—কোথায়—গেলে মা,"—তার পর—তার পর —সব শেষ!

২

পাঁচ বৎসর পরের কথা। সংসারের কতই না পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। বিধাতার ইঙ্গিতে মানুষের সাজান সংসার একবার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, আবার তাঁহারই অলঙ্ঘনীয় আদেশে নূতন প্রাণ নূতন উদ্দীপনা লইয়া, নূতন সংসার গড়িয়া তোলে।

বেলার উপার্জ্জনক্ষম স্বামী নলিনকুমার কয়লার ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাণীগঞ্জে তাঁহার বড় বড় কয়লার খনি বন্দোবস্ত করা ছিল। সততা ও নিয়মানুবর্ত্তীতার গুণে চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার বিস্তর অর্ডার আসিত এবং স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বলে তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

নলিনকুমার ধনীর সন্তান ছিলেন না। সংসারে তাঁহারা তিনটি ভাই— শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া বহুকষ্টে মানুষ হইয়াছিলেন। অগ্রজ দুই ভাই

অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের খরচেই লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলিপুর কোর্টে আইন ব্যবসা করিতেন এবং মধ্যমটি কলিকাতা সেক্রেটারিয়েটে বেশ বড় চাকুরী করিতেন। এখন তাঁহাদের অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল। কনিষ্ঠ নলিনকুমার কোন প্রকারে এনট্র্যান্স পাশ করিয়াছিলেন; উচ্চশিক্ষা পাইবার সুযোগ আর ঘটিয়া উঠে নাই। আপনাকে ভরণপোষণ করিতে যে অক্ষম, তার পক্ষে বিবাহ করাটা যে কত বড় বিড়ম্বনা এবং শ্বশুরের গলগ্রহ হয়ে থাকা যে কতটা অপ্রীতিকর, তাহা ভাইদের দেখিয়া নলিনকুমারের বেশ শিক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু এদিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নলিনকুমারের বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠেন। তিনি ভাইকে কোন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার স্কন্ধগত করিয়া আপনাদিগকে ভ্রাতৃদায় হইতে মুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ছোট ভাইকে তাহার বিবাহের প্রস্তাবটা নিজে না করিয়া—স্ত্রীকে দিয়া প্রথম নলিনকুমারের মতামত জানিয়া লওয়া তিনি সমীচীন মনে করিলেন। অন্য সময়ে—একদিন নলিনকুমারের ভ্রাতৃবধূ তাহাকে বলিলেন, "ঠাকুর-পো, তুমি বে-থা কর একলাটি আর কতকাল থাকবে। আমাদের আর একটি ছোট্ট বোন্ ঘরে এনে দাও।

—"বটে—নিজেই খেতে পাচ্ছি না—আবার আর একটাকে জোটাব?"

—"ষাট্, ওকি কথা! বেটা ছেলে, তোমাদের আবার ভাবনা কি?"

—"বৌদি, ভাবনা যে কি, তা তোমাকে কি করে বোঝাব বল?"

—"বোঝাবার কিছু প্রয়োজন নেই; একটা খুব ভাল সম্বন্ধের প্রস্তাব আছে। তোমাকে বে করতে হবে, এই অবধি কথা।"

—"না বৌদি. পরিবার প্রতিপালনে যে অক্ষম, বিয়ে করা তার সাজে না। বাংলায় ত দরিদ্র ভদ্র পরিবারের অভাব নেই; তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে কোন লাভ আছে কি?"

—"ঠাকুরপো, তুমি ভুল বুঝেছ। তোমার মত মেনে চল্‌তে হলে বাংলায় ক'টা ছেলে বিয়ে করতে পারে ?"

—"যে ক'টা ছেলে বিয়ে করতে পারে শুধু তাদেরই বে করা উচিত। 'অক্ষম' যারা বিবাহ করা তাদের পক্ষে মহাপাপ। বাংলার ছেলেরা যদি সক্ষম না হওয়া অবধি বিয়ে না করে, তবেই বাঙ্গালী জাতিটা আসন্ন ধ্বংসের মুখ হতে রক্ষা পেতে পারে। যে নিজের বোঝা বইতে পারে না, তার মাথায় আর একটি বোঝা চাপিয়ে দিলে, সে সহজেই মাটিতে নুইয়ে পড়বে; মাথা তুল্‌তে পারবে না ; কঠোর জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াবার শক্তি থাক্‌বে না। শুধু যে সে নিজেই হীন হয়ে বেঁচে থাকে তা নয়, তার ভবিষ্যৎ বংশটাকে হীন করে রেখে যায়। ব্যক্তিগত অপরাধে একটা জাতির ভেতর যে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করে, তা শোধরাতে অনেক সময় লাগ্‌বে, হয়ত বা শোধরাবেই না।"

—"তোমার মতে কি এ সমস্যার প্রতিকার বিবাহ না করা ?"

—"না, ঠিক তা নয়। বিবাহ করতে ত আমি কাউকে নিষেধ করি না ; আর আমার নিষেধ লোকে শুন্‌বেই বা কেন ? তবে আমার বিয়ের জন্য তোমরা একটু ব্যস্ত, তাই আমার ব্যক্তিগত মতটা তোমাদের জানাবার অধিকার আমার আছে। আমি ত কখনো বলি নি বৌদি যে, আমি বিয়ে করব না, তবে আমার মত এই যে, সক্ষম না হয়ে, পরের বোঝা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে গ্রহণ করব না।"

—"দশজনের সঙ্গে সংসার করতে হলে, সব সময় নিজের মতের বড়াই নিয়ে থাক্‌লে চলে না।"

—"কিন্তু বৌদি নিজের মতটা সবচেয়ে বড় ও সত্য বলে মনে করা আমার স্বভাব। হয়ত সব সময় তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু মনে মনে চিরদিনই নিজের মতটাকে শ্রেষ্ঠ বলে পোষণ করি।"

—"আচ্ছা ঠাকুরপো, এক্ষেত্রেও বরং নিজের মতটা প্রকাশ করা সম্ভব হল না বলেই মনে কর।"

—"তাও কি হয় বৌদিদি, বিবাহ করাটা কি ছেলেখেলা। দায়িত্ব জ্ঞানহীন যারা, তাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আমি তা পারব না।"

—"অত ভাবলে কি আর সংসার চলে ? তোমার দাদারা যখন বিয়ে করেছিলেন, তাঁরা ত সক্ষম ছিলেন না মোটেই ; কিন্তু আজ তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন ত।"

—"দাদারা যদি কোন ভুল করে থাকেন, জেনে শুনে আমাকেও যে তাই করতে হবে, এমন কি কথা আছে ?"

—"কি জানি ঠাকুরপো, তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে কি আর আমি পারি ? তোমার দাদা, আমায় বল্‌তে বলেছিলেন তাই বল্‌লুম, এখন ভাই তোমার যা খুসী করো।"

—"তাই ভাল।"

এই ব্যাপারের কয়েকদিন পর নলিন কুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহার এক সম্বন্ধের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পাত্রীর পিতা খুব সঙ্গতি-সম্পন্ন ; পিতার একমাত্র মেয়ে ; সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। পাত্রীর পিতার ইচ্ছা যে জামাতাটি চিরকাল তাঁহার বাড়ীতেই থাকিবেন এবং বিষয় কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। ভ্রাতার শত অনুরোধ ও শত প্রলোভন সত্ত্বেও নলিন কুমার এ প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কয়লার ব্যবসায়ের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাই তিনি ভাইকে বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ তিন চার হাজার টাকা নগদ দিতে স্বীকৃত হয় এবং যথাসময়ে উহা পুণগ্রহণ করিতে রাজী থাকে, তবে তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত।

এই প্রস্তাবে নলিন কুমারের ভ্রাতা উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "হাঁরে

নলিন, তোর এমন কি বিদ্যা বুদ্ধি গজিয়েছে যে লোকে চার হাজার টাকা দিয়ে তোকে জামাই করবে ?”

—“দাদা, বিদ্যের গর্ব্ব নেই বটে কিন্তু আত্মসম্মানের জ্ঞানটা যথেষ্ট আছে। পুরুষ হয়ে সারাজীবন পরের গলগ্রহ হয়ে থাকব, পরের অনুগ্রহে নির্ভর করে বেঁচে থাকব, তা হবে না। এমনভাবে মনুষ্যত্বকে নিজের ব্যক্তিত্বকে পদদলিত করতে পারি না। আমাকে চার হাজার টাকা ধার দিয়ে কেউ মেয়ে বিয়েও দেবে না ; আমি এখন বিয়ে করতেও মোটেই রাজী নই, সেজন্য তোমরা ভে’ব না।”

—“আ—যা—’হোক, একটা কিছু পথ দেখতে হবে ত ? শুধু শুধু বসে থাকলে আমাদের পোষাবে কেন ?”

—“দাদা, তা আমি বেশ জানি। তোমাদের পথ তোমরা দেখে নিয়েছ, আমিও আমার পথ খুঁজে নোব। আমি এখন কার্য্যক্ষম। মোট বয়ে জীবিকা অর্জ্জন করতে হয় তাও ভাল ; তবু কারো অনুগ্রহ চাইব না। আমার জন্য আর তোমাদের ভাবতে হবে না।”

নলিনকুমার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য বহির্গত হইয়া—কপর্দ্দকহীন অবস্থায় রাণীগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে নিজ বুদ্ধিকৌশলে একটা কয়লার খনিতে সামান্য কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ম্যানেজার সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সেই অঞ্চলে ম্যানেজার সাহেবের নিজের কয়েকটি খনি ছিল। নলিন কুমারের সততা, কর্ম্মকুশলতা ও পরিশ্রমগুণে মুগ্ধ হইয়া সাহেব তাঁহাকে ঐ সকল খনি পরিদর্শনের ভার অর্পণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই খনি সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ব করিয়া নলিনকুমার ঐ সমস্ত খনির বন্দোবস্ত লইতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ছয় সাত বৎসরের মধ্যে নলিনকুমার একজন অবস্থাপন্ন লোক হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে নলিনকুমারের জ্যেষ্ঠভ্রাতাদ্বয় প্রায়ই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন এবং উপযুক্ত ভাইয়ের বিবাহের জন্য একটি সুপাত্রীর অনুসন্ধান

করিতে আরম্ভ করেন। তারপর বিধির নির্ব্বন্ধে নলিনকুমারের সহিত আমাদের সুরেশ্বর বাবুর রূপগুণবতী কন্যা বেলার বিবাহ হয়। কন্যার বিবাহ সুরেশ্বর বাবু খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন নাই; কারণ তিনি ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তরুণী ভার্য্যা স্বামীর রুগ্ন স্বাস্থ্য ও নবজাত শিশুপুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া যতটা ব্যয় সঙ্কোচ সম্ভব, তাহা করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তা—তিনি বুদ্ধিমতীর কার্য্যই করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বেলা স্বামীর নিকট চলিয়া গেল। সেখানে নূতন সংসার গুছাইতে সে কিছুদিন ব্যস্ত ছিল। বিবাহের এক বৎসর পরে বেলা মিনিকে সঙ্গে লইয়া যায়। নলিনকুমারের সহিত পরামর্শ করিয়া বেলা স্থির করিল যে, মিনি আর একটু বড় হইলেই কলিকাতা বেথুন বোর্ডিংএ রাখিয়া তাহাকে সুশিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিবে। নলিনকুমার যেমন প্রচুর অর্থ উপায় করিতেন, তেমনই আপনাদের আহার, বিহার, বেশভূষা, আস্‌বাব্‌পত্র ও দান-দাক্ষিণ্যে প্রায় সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিতেন; সঞ্চয়ের দিকে তাঁর কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। ধনবান যুবকের গৃহিণী—বেলা—রাজ-রাণীর মত চলা ফেরা করিত, দীন, দরিদ্র ও অনাথের প্রতি তাহার করুণার সীমা ছিল না।

বেলা তখন উনবিংশতি বর্ষীয়া তরুণী যুবতী। সংসার তাহার নিকট কত সুখের। কত আশা, কত প্রলোভন কত উন্মাদনা তাঁহাদের প্রেমবিহ্বল দাম্পত্য জীবনে। নলিন কুমারও বেলাকে লইয়া বড় শান্তিতে সংসার আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ শান্তি ও সুখের পশ্চাতে যে দুঃখ লুকাইয়া থাকে, নব-দম্পতি তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। দেবতা যে এমন নিদারুণ অভিশাপ লইয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তাহা কে জানিত? নবদম্পতির এ সুখভোগ বুঝি দেবতা বেশীদিন সহিতে পারিলেন না।

বিবাহের চারি বৎসর অতীত হইতে না হইতে নলিনকুমার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন।

কলিকাতার বড় বড় ডাক্তাররা প্রাণপণ চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু নলিন কুমারের জীবন রক্ষা পাইল না। বেলার পিতা আসিয়া জামাতার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। মাতৃহারা শিশুগুলির অমঙ্গল আশঙ্কায় আবার তাঁহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। এত সুখ সম্পদের অধিকারিণী করিয়া ভগবান বেলাকে আবার কাঁদাইলেন, পথের ভিখারিণী সাজাইলেন। তাহার সিঁথির সিন্দুর চিরতরে মুছিয়া গেল; হাতের শাখা অলক্ষে খসিয়া পড়িল।

মাতৃহীনা দুটী বোন্ আবার অকুলে ভাসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

৩

"ও বেলা, ও পোড়ারমুখী, বেলা হ'ল যে উঠ্‌বি নি? ঘর ঝাঁট দিবি নি? দুয়োর নিকোবি নি?—মরণ, আমার তিন কুল জ্বালিয়ে এখন আমার হাড় জ্বালাতে এসে জুটেছে। কোথাও ত ঠাঁই হল না! কেউ আঁচ সইতে পারলে না! আগুনের ফুল্‌কি! সোণার পরাণ সব বেরিয়ে গেল! পোড়ায় মুখীর ত মরণ নেই! সর্ব্বনাশী! রাক্ষসী। ছোট বেলা মাকে খেয়েছিস্! কচি স্বামীটাকে খেলি! আর বাকী কি রয়েছে? দুনিয়ার কোথাও ঠাঁই না পেয়ে আমার পায়ের তলায় এসে জুটেছ—"

—"মা সকাল বেলা অমন করে আমায় মুখ করছ কেন? এ সংসারে কি আমার কোন অধিকারই নেই? যেখানে একদিন বড় স্নেহে লালিতা পালিতা হয়েছি, সে পিতৃগৃহে আজ আমি একটা অভিশাপ! একটা অমঙ্গল! হায়, ভগবান! আজ আমি নাকি দুমুঠো অন্নের কাঙ্গালিনী! এমন কত অন্ন অকাতরে বিতরণ করেছি।—"

—"আপদ জুটেছে ভালো ! ন্যাকাপনা আর করতে হবে না ! এখানে আবার তোর কি অধিকার রয়েছে ! একবেলা চারটে ভাত, তাও আমার অনুগ্রহ। কুলের কলঙ্ক না হয়, তাই ঘরে থাক্‌বার স্থান দিয়েছি ; নইলে কোথায় কোন্ ভাবে কার কাছে তোর থাকৃতে হ'ত কে জানে ? ভাল কথা, দ্যাখ্—এই—সতীশ বাবুদের বাড়ী থেকে এখনি গাড়ী আস্‌বে ; আজ তার মেয়ের বিয়ে। আমরা সবাই যাব। তোর ত আর যাওয়ার যো নেই। শুভ কাজে তোর যোগ দেওয়ার মত কি অধিকার আছে ? তুই যে একটা অমঙ্গল ! নিঃসন্তান ! তোর যে নরকেও স্থান নেই। মরলে পিণ্ডি দেওয়ার অধিকারও কারো থাক্‌বে না। ভুটকুড়নি পোড়ারমুখী ! বয়স ত আর কম হয়নি ! এ বয়সে যে তিন ছেলের মা হওয়া যেত।

—যাক্,—শুন্‌ছিস্ ? তুই বাড়ীতে থাক্‌বি। একেলা ত থাক্‌তে পারবি নি। মিনিও তোর সঙ্গে থাক্‌বে। আমরা রাত্তিরে বাড়ী ফিরব।'

—"মিনিকেও সঙ্গে নিয়ে যাও মা।"

—"থাক্, থাক্, আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই। তোকে একলা ঘরে ফেলে যাই ; একটা কিছু ফ্যাসাদ করে বোস্ ; তখন জ্বালা কার ? আমার না তোর ? পোড়ারমুখীদের নিয়ে এমন জ্বলনেও পড়েছি।"

বেলা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

অবলম্বনহীনা বালবিধবারা—হিন্দুসমাজের এই নির্য্যাতন আর কত কাল সহ্য করিবেন, জানি না। তাঁহাদের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে ভারতের আকাশ বাতাস উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নারী মায়ের জাতি ; যে দেশে নারীর অভিশাপ, সে দেশের সন্তানের কখন ও কল্যাণ হতে পারে না। জগতের সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব জাতিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যুগে বাইরের আলো বাতাসকে জোর করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিলে আর চলিবে না। অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে ও

অবরুদ্ধ অন্দরের ভিতর নূতন আলো-বাতাস অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। কালের এ প্রবাহ রোধ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই।

যথাসময়ে উমাকিশোরী তাঁহার পুত্র গোপালকে লইয়া চলিয়া গেলেন। বেলা ও মিনি বাড়ীতে রহিল। সারাদিন তাহারা গৃহের সমস্ত কাজকর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যাকালে উন্মুক্ত বাতাসে ছাদের উপর বসিয়া কয়েকটা গান গাহিল। বেলা খুব ভাল গান গাহিতে পারিত। কিন্তু বিধবা হওয়ার পর আর গান গাহিবার ইচ্ছাও হয় নাই, সুযোগও পায় নাই। তাহাদের সেই সুমধুর স্বরলহরী যাহারা শুনিয়াছিল তাহাদের মধ্যে জনৈকা বর্ষীয়সী মহিলা পরদিন উমাকিশোরীর নিকট বেলা-মিনির সুন্দর সঙ্গীত-জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেছিলেন। উমাকিশোরী মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কের সাহায্যে সমস্তটা ব্যাপার জলের মত বুঝিয়া ফেলিলেন এবং রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রন্ধন নিরতা মিনির কেশাকর্ষণ করিলেন। বর্ষীয়সী মহিলাটি হিতে বিপরীত দেখিয়া বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। বেলা হাতের কাজ ফেলিয়া সেই ভৈরবী মূর্ত্তির আক্রমণ হইতে মিনিকে রক্ষা করিল। তারপর উমাকিশোরী অসহায় বালিকাদ্বয়কে যথেচ্ছা গালাগালি করিতে আরম্ভ করিলেন। বেলা আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছিল—"ছোটমা, বয়সে ত তুমি আমার চেয়ে খুব বেশী বড় নও; ন্যায় অন্যায় জ্ঞান তোমার চেয়ে আমারও খুব কম নয়।"

—"হ্যাঁ—লো—পোড়ার মুখী ছোট মুখে বড় কথা। দিনান্তে যার একমুঠা অন্ন জোটা ভার,—তার আবার অত বাহাদুরী কেন লা? থ্যাংরা দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দোব! আবাগীর বেটীর সখ্ আর মেটেনা। সখ করবি ত এমন হবি কেন? আবার ছাদের উপর বসে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাওয়া। বেহায়া মাগীর লজ্জাও নেই। ভাগ্যিস্ অমন কড়া শাসনে রেখেছি; নইলে এ আবাগী যে এতদিনে কোন্ কেলেঙ্কারী করে বস্‌ত, তার ঠিকানা নেই। পোড়া মিন্সে এলে হয় এবার; যার অত জ্বালা

তার আবার বে করতে সাধ যায় কেন? এবার এলে যার পাপের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্দি হব। সে তার আদুরে দুলালীদের নিয়ে যে চুলোয় পারে মরুক্‌গে। আমি এদের রাখ্‌তে পারব না।" —এই বলিয়া উমাকিশোরী বাহির হইয়া গেলেন।

সুরেশ্বর বাবু এসময় বাড়ী ছিলেন না। তিনি কলিকাতা পোর্ট কমিশনার আফিসে মোটা মাহিনায় চাকুরী করিতেন। উমাকিশোরীর পরামর্শানুসারে তাঁহাকে কার্য্য স্থলে একাকী থাকিতে হইত। পরিবার নিয়া বিদেশে অতিরিক্ত খরচ; তাই বুদ্ধিমতী গৃহিণী কিছুদিন বাড়ীতে থাকাই মনস্থ করিয়াছিলেন।

বিশেষতঃ মিনিও বয়স্থা হইয়া উঠিতেছিল; যেমন করিয়া হউক তাহাকে পাত্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যও কতকটা ছিল। উমাকিশোরীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সুরেশ্বর বাবু একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা শশিশেখরের সহিত পৃথক হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শশিশেখর এলাহাবাদে ওকালতি করিতেন। তিনি নূতন ভ্রাতৃবধু ও স্ত্রৈণ ভ্রাতার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী ঘরে বিশেষ আসিতে চাহিতেন না। মোক্ষদা ঝিকেও শশিশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বেলা মিনিকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। কিন্তু উমাকিশোরী কিছুতেই সেই পুরাতন ঝিকে গৃহে রাখিতে স্বীকৃতা হন নাই। বেলার বৈধব্য সংবাদ শুনিয়া মোক্ষদা দেশে ছুটিয়া আসে এবং বেলা ও মিনিকে এলাহাবাদে লইয়া যাওয়ার জন্য উমাকিশোরীকে বিশেষ অনুরোধ করে কিন্তু তিনি সেই সময় খুব দরদ ও মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া বলিলেন, আজ যদি বেলা ও মিনির মা জীবিতা থাকিতেন, তবে কি মোক্ষদা উহাদিগকে কাকীমার নিকট লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিতে পারিত, ইত্যাদি।

সরল প্রাণ মোক্ষদা উমাকিশোরীর সহানুভূতিসূচক ব্যবহারে পরম আপ্যায়িত হইয়া পুনরায় এলাহাবাদে চলিয়া গেল।

মোক্ষদা চলিয়া যাওয়ার পর উমাকিশোরী ধীরে ধীরে বেলার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ বেলা বিমাতার এই প্রকার অসদ ব্যবহারের কোন কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। ক্রমে সে জানিতে পারিয়াছিল উমাকিশোরীর ভাই তাঁকে পরামর্শ দিয়াছে যে বেলাকে স্থায়ীভাবে পিতৃগৃহে থাকিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়; কারণ ইহাতে গোপালের স্বার্থের হানি হইতে পারে। যেহেতু সুরেশ্বর বাবু বেলাকে ভালবাসেন এবং সম্প্রতি তিনি যে খসড়া উইল তৈয়ার করিয়াছেন, উহাতে তাঁহার সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ বেলার নামে লিখিয়া দেওয়া স্থির করিয়াছেন। পুত্রের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় উমাকিশোরী তাহার সমস্তটুকু দানবীশক্তি লইয়া বেলা মিনির উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছেন।

৪

নলিনকুমার মৃত্যুর পূর্ব্বে একটা খুব বড় রকমের কয়লার খনির বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। কিন্তু আরব্ধ কার্য্য শেষ না হইতেই তাঁহাকে ইহলীলা সম্বরণ করিতে হয়। মৃত্যুশয্যায় শায়িত নলিনকুমার তাঁহার প্রিয়বন্ধু বিজয়ের হাত ধরিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন,—"ভাই বিজয়, অনেক আশা ছিল; এবারে আর তা পূর্ণ হল না বহু আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মৃত্যুর পরপারে যাত্রা করলাম্; আবার আস্তে হবে। বেলা অনাথা হ'ল। এ খনির তত্ত্বাবধান তুমিই করো। বুঝে চালিয়ে নিতে পারলে যথেষ্ট লাভ হবে। লাভের অংশ সমস্ত হাতে এলে বেলাকে কিছু দিও; আর বাকী সব তোমার। বহু আশায় উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ এই খনিতে ব্যয় করে ফেলেছি। দেখো ভাই, অর্থাভাবে যেন শেষ জীবনে বেলার কষ্ট না হয়।"

বিজয় তখন পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় অদম্য উৎসাহী যুবক। মুমূর্ষু বন্ধুর শেষ কথা কয়টি সে জীবনে কখনোও ভুলে নাই। দুই বৎসর অক্লান্ত

পরিশ্রমের পর ব্যবসায়ে নব্বই হাজার টাকা লাভ হইল। বিজয় তদানীন্তন কোন বড় ব্যাঙ্কে বেলার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া ব্যাঙ্কের সমস্ত কাগজ-পত্র চেক বহি ইত্যাদি সহ নলিনকুমারের শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হইল। নলিনকুমারের জীবদ্দশায় সেখানে সে একবার গিয়াছিল এবং বেলার সহিতও তার খুবই আলাপ পরিচয় ছিল। কিন্তু সে উৎসবের দিন ত ফুরাইয়া গিয়াছে। সংসারে সব আছে, শুধু নাই নলিনকুমার।

যথাসময়ে বিজয় সুরেশ্বর বাবুর বাড়ীতে পৌঁছিল। প্রথমেই মিনির সাথে সাক্ষাৎ। বিজয়কে দেখিয়া মিনি আহ্লাদে ছুটীয়া আসিল। বিজয় তাহাকে বরাবরই খুব স্নেহ করিত। মিনির নিকট বিজয় তাহাদের পারিবারিক সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত অবগত হইল। সে কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে মিনি কাঁদিয়া ফেলিল; বিজয়ও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। মিনি গৃহে ফিরিয়া দিদির নিকট বিজয়ের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিল। স্নানাহারাদির পর বিজয় বেলা ও মিনিকে ডাকিয়া নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

—"আচ্ছা বৌদি, তুমি ত আমায় কোন দিন জানাও নি, যে তোমাদের এমন কষ্ট হচ্ছে। নলিনকুমার সহোদর ভাইয়ের মত আমায় ভালবাস্‌ত। তোমাদের আমি সহোদর চেয়ে বেশী ভালবাসি। তুমি জান না, বৌদি, শুধু তোমাদের কষ্টের লাঘব করবার জন্য আমি গত ৬ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে নলিনের শেষ উপার্জ্জনের ছড়ান অর্থ সংগ্রহ করেছি। খনিটায় বিস্তর লাভ হয়েছে। লাভের টাকা সবটা তোমারই ত প্রাপ্য বৌদি!"

—"না ঠাকুরপো, তুমি পরিশ্রম করে উপার্জ্জন করেছ; এ অর্থ তোমার।"

—"আমার কি করে হতে পারে, এ খনিতে যে আমার বিন্দুমাত্র স্বত্ব

নেই। নলিন যে অর্থ ছড়িয়ে রেখে গেছ্‌ল, আমি শুধু সেই ছড়ান অর্থ সংগ্রহ করেছি।”

—“না ভাই, এ অর্থ তোমারই।”

—“তা কখনও হতে পারে না বৌদি; খনি যে এখনও তোমারই নামে চল্‌ছে। আমি তোমার এ ব্যবসায়ের অংশীদার মাত্র। এই নাও ব্যাঙ্কের কাগজ পত্র; মোট নব্বই হাজার টাকা লাভ হয়েছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমার নামে ব্যাঙ্কে জমা আছে। দশ হাজার টাকা কর্ম্মচারীদের বকশিশ্‌ বিতরণ করা হয়েছে। ত্রিশ হাজার টাকা আমি পারিশ্রমিক স্বরূপ নিয়েছি। কিন্তু খনির স্বত্বাধিকারিণী তুমি।”

—“এ অর্থে আমার কি প্রয়োজন ঠাকুরপো।”

“প্রয়োজন আছে বৌদিদি, এ সংসারে অর্থের প্রয়োজন খুব বেশী। অর্থ সাংসারিক মানুষের বল বুদ্ধি ভরসা। আজ তুমি আপন মনের দিকে একবার চেয়ে দেখ, কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছ কিনা? তোমার এই হৃত সম্পদলাভে মনে একটা শক্তি জেগেছে কিনা?”

—“ঠাকুরপো, তোমার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তুমি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট সয়েছ।”

—“না বৌদি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন প্রয়োজন নেই। বরং আমিই তোমার নিকট ঋণী। যেহেতু তোমাদেরই কার্পণ্যহীন স্নেহ-মমতায় এবং তোমাদেরই প্রদত্ত অর্থে আমি আজীবন পরিপুষ্ট। আচ্ছা বৌদি তোমার ভাশুর ও জায়েরা কি তোমার কোন খবর নিচ্ছেন না?”

—“না, তাঁরা হয়ত প্রয়োজন মনে করেন না। খোঁজ খবর নিলেই পাছে আমি তাঁদের স্কন্ধগত হই, এই আশঙ্কায়ই তাঁরা যে কোন সংবাদ নিচ্ছেন না, তা আমি জান্‌তে পেরেছি। তাঁরা জানেন যে আমার স্বামীর সমস্ত ব্যবসায় নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি কপর্দ্দকহীনা।”

—“তা যাক্‌; বৌদি, মানুষের সব দিন সমান যায় না।”

—"ঠাকুরপো, নিজের দুরবস্থা দেখে আমার মনে হয়, হিন্দু সমাজের অন্দরের ভেতর আমার মত আরও কত শত অসহায় নারী লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হচ্চে। আমার ইচ্ছে হয়, যদি সম্ভব হত তবে নারী জাতির এ দুর্দ্দশা মোচনের কতকটা চেষ্টা করতাম্। জাতি নির্ব্বিশেষে ভারতের নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তার করা ও তাদের মুক্ত আলোবাতাসের সন্ধান দেওয়া যেন আমার ক্ষুদ্র জীবনের ব্রত হয়।"

—"বৌদি, তুমি তোমার সমস্ত শক্তি নিয়ে অগ্রসর হও। আমি সে শক্তির পেছনে প্রয়োজনানুসারে সাহায্য করি। দেখি, ভাই বোনের সম্মিলিত চেষ্টায় নারী সমাজের উদ্ধারের পথ বাহির হয় কিনা?"

—"তা হ'লে ভাই আমরা কি করব, জানো? প্রথমতঃ দেশ বিদেশে অসহায় নারীদের সাহায্য করব; তারপর শিক্ষাভিলাষিণী সধবা, বিধবা, যুবতী বা বালিকাদের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করব। কল্‌কাতায় বাড়ী ভাড়া করে, যাদের স্কুল কলেজে পাঠান দরকার, তাদের ব্যবস্থা করব। যাদের শুধু গৃহশিক্ষা দেওয়া দরকার, তাদের তাই দোব। সুদূর পল্লীতে পল্লীতে সহৃদয় গৃহস্থের অন্দরে পল্লীবাসিনী অন্তপুর মহিলাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করব। যতটা সম্ভব নারীকে গৃহশিল্প প্রভৃতি এমন কোন বিদ্যা শেখাতে হবে, যেন তাকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপর নির্ভর করতে না হয়। সম্পূর্ণরূপে যাকে পরের উপর নির্ভর করতে হয় সে কোন প্রকার স্বাধীনতার দাবী করতে পারে না। স্ত্রী-স্বাধীনতার মূল আত্ম-নির্ভরতা। সব অন্তঃপুরচারিণীদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। যদি কাউকে বিদেশে পাঠান প্রয়োজন হয় পাঠিয়ে দোব। অর্থের জন্য ভেবো না, আমার যা কিছু আছে সবই এই ব্রত উদযাপনের জন্য উৎসর্গ করব; তারপর বাইরের সহানুভূতি ও যে না পাব তা নয়। আর তোমার ব্যবসায়ের লাভের টাকাও হয়ত কিছু কিছু নিশ্চয়ই

দেবে। জগতকে একবার দেখাব সঙ্ঘবদ্ধ নারীশক্তি। শিক্ষিত নারীশক্তি ভারতে নবযুগের সৃষ্টি করবে।

—"বৌদি নারীশক্তির কথা ভারতের ত অবিদিত নাই। ভারতের সভ্যতা সব চেয়ে প্রাচীন। সমস্ত জগত এ জ্ঞান ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে আজ উন্নত। আর "সবার পূজ্য চিরবরেণ্য" ভারতে কত পেছনে ? কিনা ছিল ভারতে ? জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শন সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির আদি লীলা-ভূমি ভারত। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বাণী এদেশেই সর্ব্বপ্রথম ধ্বনিত হয়েছিল; কিন্তু আজ তা আমাদের নূতন করে শিখতে হচ্ছে পরের মুখে। সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, লীলাবতী, খনা, দময়ন্তী, সতী-বেহুলার দেশ এ পুণ্য ভারত। মাঝখানে যে যুগটা ভারতের উপর দিয়ে বয়ে চলে গেছে, সে যুগটা ছিল সুষুপ্তি ও বিস্মৃতির যুগ। আত্ম বিস্মৃত জাতি ভারতবাসী, নারীশক্তিকে আজও ভারত আদ্যাশক্তিরূপে পূজা করে থাকে কিন্তু সেই প্রচণ্ড শক্তি আলোবাতাস হীন বদ্ধগৃহে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কে জানে এই অধঃপতিত জাতির পরিণাম কোথায় ?"

—"ঠাকুরপো, শক্তির মর্য্যাদা করতে না জানলে ভগবান তার এমনই শাস্তি বিধান করে থাকেন। ত্যাগের ধর্ম্মে, বীরের ধর্ম্মে, জ্ঞান গরিমায় ভারত একদিন সবার বরেণ্য ছিল। কিন্তু আলস্য পরমুখাপেক্ষিতা, আত্ম-কলহ, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা ও মিথ্যা মান অভিমান নিয়ে সে সোনার ভারত আজ ডুবে আছে। জগতের বরেণ্য জাতি আজ সুপ্ত ; হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা ও ব্যভিচার এদের অলঙ্কার। একের পাপে সমাজের পাপ, সমাজের পাপে জাতির পাপ, জাতির পাপে সমগ্র দেশের পাপ। ভারতের নর নারী, আবালবৃদ্ধবনিতা সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক। আচ্ছা ঠাকুরপো, আবদ্ধ গৃহের সেই পুঞ্জীভূত নারী শক্তি আবার কি হুঙ্কার করে যেতে উঠতে পারে না ? মায়ের জাতি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জেগে উঠলে, কোলের শিশুগুলি জেগে উঠবে না কি ?"

—"বৌদি আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না যে, যার বাসনা এত উচ্চ, উদার ও বিশ্বজনীন তার প্রতি ভগবানের এ কঠোর বিধান কেন ? ”

—"কঠোর নয় ভাই ; সেই বিরাট পুরুষের কোমল হস্ত স্পর্শ ক্ষুদ্র প্রাণ আমরা হঠাৎ সইতে পারি না তাই মাঝে মাঝে আঁতকে উঠি। একবার ভেবে দেখেছ কি, আমাদের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের বাইরে কত বড় জগত। সেখানে কোটি কোটি প্রাণী বিচরণ করছে, অথচ হিংসা কলহ নেই ; সে দেশ অদৃশ্য আমরাও সে দেশেরই যাত্রী।"

—"নলিন কুমার জীবিত থাকৃতে ও এসব বিষয় নিয়ে তোমার সাথে কত আলোচনা করেছি। তুমি আমাদের কত উপদেশ দিতে ; সে রকম উচ্চাঙ্গের উপদেশ বাণী তোমার মত একটি বালিকার নিকট প্রত্যাশা করা যায় কিনা এ প্রশ্ন মনে উদয় হলেই ভক্তিতে আমার মস্তক যেন তোমার চরণে অবনত হয়ে পড়ে। তুমি জ্ঞানবৃদ্ধা। ভগবান তোমায় এত শক্তি দিয়ে গড়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর কঠোরতম বিধানগুলি যে তোমারই উপর বজ্রপাতের মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।"

—"তাঁর যে কোন বিধান আমাকে অম্লান বদনে সহ্য করতে হবে। ভগবানের প্রতি এবং নিজের প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আমি যে জগতে অনেক কাজ করতে পারি। আমি যে ভারতের মায়ের জাতি, শক্তিস্বরূপিনী। যারা নিজেকে জানে না, তারাই দুর্ব্বল, পর-মুখাপেক্ষী।"

—"এত শক্তি তোমার! আমি অবাক্ হয়ে ভাবি যে, সে শক্তি বিমাতার দুর্ব্যবহারের প্রতি এত উদাসীন কেন ?"

—"আমি দেখ্‌ছিলাম্, নারীর প্রতি নারীর অত্যাচার কতটা সম্ভব! ভারতের আজ কত অধঃপতন। আমার মত অসহায়া যারা, তারা যে সমাজের নিকট কত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, আমি সেই অত্যাচারের একটু ভাগ নিয়েছি মাত্র। তা ছাড়া সহায় সম্বলহীনা হয়ে বিমাতার

আশ্রয়ে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হয়ে প'ড়েছিলাম। পিতা বিদেশে; বড় বিপদেই প'ড়েছিলাম ভাই; তোমার আগমনে আমার পূর্ব্বশক্তি জেগে উঠেছে আমি আর যেন অসহায় নই। আর এক কথা ঠাকুরপো, আবার তোমাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি; আর আশীর্ব্বাদের সঙ্গে তোমায় উপহার দিচ্ছি, আমার রাণীগঞ্জের কয়লার খনি। আজ থেকে এ খনির একমাত্র সত্ত্বাধিকারী তুমি। যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র ভক্তি-ভালবাসা থাকে, তবে আমার স্নেহের উপহার স্বরূপ এ খনির সত্ত্বাধিকারিত্ব অকুণ্ঠিতচিত্তে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করো। যথাসময়ে দানপত্র রেজেষ্টারী করার বন্দোবস্ত হবে।"

—"আচ্ছা বৌদি, এখন তা হ'লে আসি; কাল আবার দেখা করব; ভাল কথা, তোমার বিমাতাকে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়েছি; তিনি তোমার জন্য অনেক কপট শোক প্রকাশ করলেন। আচ্ছা বৌদি, মেয়েমানুষ এমন কপটও হ'তে পারে?"

—"হাঁ ভাই, সব পারে; দেবী, দানবী দুই-ই হতে পারে। নারী চরিত্র বড় জটিল।"

—"তা হ'লে আসি বৌদি।"

—"এসো ঠাকুর পো।"

৫

আট বৎসর পরে।

বেলা এখন মাদ্রাজ মহিলা সমিতির সম্পাদিকা। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ধীশক্তি গুণে মুগ্ধ হইয়া মাদ্রাজের শিক্ষিতা-মহিলা সম্প্রদায় তাহাকে তাঁহাদের নেতৃত্বে বরণ করিয়াছেন। মাদ্রাজে এই শ্রেণীর নারীগণ যেমন শিক্ষিতা তেমনই নিঃসঙ্কোচে পুরুষের সমান অধিকার লাভের জন্য সচেষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে এমন একদল নারী গঠিত হইয়া

উঠিতেছেন যাঁহারা হয়ত একদিন নারীশক্তির প্রভূত পরিচয় দিয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিবেন। বেলা এখন সেই সমাজ ভুক্তা।

বেলার যত্ন চেষ্টায় মিনি বি, এ পাশ করিয়াছে, এবং আমেরিকা গমন করিয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। বাংলা দেশের বহু মেয়ে বেলার অর্থ সাহায্যে বোর্ডিং এ থাকিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছে।

সেইবার কলম্বোর নারী-সমিতির সম্পাদিকা বেলাকে তাঁহাদের দেশে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বেলা সেখানে গিয়া এমন প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, যে সিংহলের শিক্ষিত সমাজ অবাক্ বিস্ময়ে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। বেলা সেখানে অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। ছয় মাস পরে তাঁহাকে আবার মাদ্রাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। মাদ্রাজের নারীগণ তাঁহাকে এমন সম্মানের চক্ষে দেখিতেন ও এমন প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসিতেন যে বেলা বঙ্গনারীদের চেয়ে তাঁহাদের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্টা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বাংলায় তাঁহার স্থাপিত নারী হিতৈষিণী সমিতিগুলি সুযোগ্যা মহিলাদের তত্ত্বাবধানে এবং তাঁহার নেতৃত্বে বেশ চলিয়া যাইতেছিল। তিনি সম্প্রতি নিজে আর বাংলা দেশে বড় আসিতে পারিতেন না।

সুরেশ্বর বাবু পাঁচ বৎসর হইল ইহলোক ত্যাগ করিরাছেন।বেলা মাঝে মাঝে এলাহাবাদ যাইয়া খুল্লতাত শশিশেখর বাবুদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। স্নেহের বোন্ মিনি আমেরিকায় ; বাংলাদেশে স্নেহের বন্ধনের মধ্যে ছিল শুধু বিজয়। বিজয় কয়লার ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভবান্ হইতেছিল। দেশ হিতকর ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় যে কোন কার্য্যের জন্য বিজয় অর্থ সামর্থ দিয়া বেলাকে সাহায্য করিত। বিজয়ের ও আপনার বলিতে সংসারে আর কেউ ছিল না!

ব্যবসায় সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এবং কতকগুলি যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বিজয় একবার ইউরোপ ও আমেরিকা

পর্য্যটনে বহির্গত হয়। আমেরিকায় পৌঁছিয়া বিজয় চিকাগোতে মিনির আতিথ্য গ্রহণ করে। মিনি তাহাকে পাইয়া কয়েকটা দিন বেশ আনন্দে কাটাইল। কিন্তু বিজয়কে শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া আসিতে হয়। বিজয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের পর মিনি প্রাণে যেন বড় একটা অভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করে। পূর্ণ পাঁচ বৎসর সে আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া এই অজানা, অচেনা, কোলাহল মুখরিত মহানগরীতে কাটাইয়া দিয়াছে। একদিনও ত কোন আপনার জনের জন্য তাহার মন বিচলিত হয় নাই। কর্ত্তব্যকে সে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিত। যেখানে কর্ত্তব্যের বন্ধন, স্নেহ মমতার দৌর্ব্বল্য সেখানে দাঁড়াইতে পারে না;—এই ছিল তার ধারণা।

সাধারণ নারীর মত দৌর্ব্বল্যকে সে কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই। সে ছিল নির্ভীক, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও কঠোর। আপনার এই কঠোর প্রাণের জন্য সে নিজকে ধন্যবাদ দিত। কিন্তু অকস্মাৎ হৃদয়ের কোন্ নিভৃততম প্রদেশে পুঞ্জীভূত স্নেহমমতা ও ভালবাসার প্রস্রবণ তাহার সমস্ত নারী-হৃদয়টাকে প্লাবিত করিয়া দিল; এ ঝঙ্কার তার প্রতি ধমনীতে ধমনীতে বিদ্যুতের মত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে যে তার কঠোর প্রাণ এমন ভাব প্রবণ হইয়া উঠিল, তাহা সে নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিল না। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তাহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার যেন সর্ব্বদাই মনে হইত,—'বিজয় যদি আর কিছু দিন এখানে থাকিয়া যাইত';—পরমুহূর্ত্তেই আবার সে শিহরিয়া উঠিত;—ছি, বিজয় তার কে? বিজয়ের জন্য তার নির্ম্মম প্রাণ এমন ভাবে কাঁদিয়া উঠে কেন? মিনি কিছুতেই আপনাকে প্রকৃতস্থ করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহার বন্ধুর নিকট নিউইয়র্কে চলিয়া গেল। মিস্ ফ্লোরেন্স মিনির একজন বিশিষ্ট বন্ধু। নিউইয়র্কের একজন বিখ্যাত ধনীর দুহিতা তিনি। কুমারী ফ্লোরেন্স মিনিকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি আজীবন কুমারী ব্রত

উদযাপন করিয়া নারীর কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। মিনিকেও সেই ব্রত পালনের জন্য অনুরোধ করিতেন।

নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া মিনি তাহার চিত্তচাঞ্চল্যের কাহিনী মিস্ ফ্লোরেন্সের নিকট আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। বুদ্ধিমতী ফ্লোরেন্স কিছুমাত্র বিচলিতা হইলেন না। স্থির ধীর ভাবে প্রিয়বন্ধুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। নারীর প্রাণের তন্ত্রী কখন্ কোন্ সুরে বাজিয়া উঠে এবং কোন্ ঝঙ্কারে কি সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, সুচতুরা ফ্লোরেন্স তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। মিনিকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া সত্বর দেশে ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন ; নতুবা সমূহ বিপদের আশঙ্কা।

৬

যথা সময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া মিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আজ আর সে বিমাতার উপেক্ষিতা অনাদৃতা মিনি নয়। মাদ্রাজের মহিলা সমিতি সর্ব্ব সাধারণের পক্ষ হইতে তাহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। তেমন ধারা অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন তেমন মনীষি ব্যক্তির ভাগ্যেও ঘটিয়া উঠে না।

মিনি যখন মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছে, বেলা তখন রোগ শয্যায় শায়িতা। দাক্ষিণাত্যে প্রবাস কালে নারীহিতৈষিনী ব্রত উদযাপনের জন্য বেলাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবা বেলা জীবনে কোন প্রকার অনাচার করেন নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মিনিকে দেখিয়া বেলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। মিনি ও শিশুর মত দিদির বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বেলা ডাকিলেন,—"মিনি, স্নেহের বোন্, আমার, কাঁদিস্ নি। তুই আজ বিজয়গৌরবে গৌরবান্বিতা ; তোর গৌরবে আমার প্রাণ ভরে

উঠেছে! তুই জয়ী হয়ে দেশে ফিরে এসেছিস্; এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আমার আর কি হতে পারে? আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। সংসারে যে, তুই ভিন্ন আমার আপনার বল্‌তে আর কেউ নেই। তোকে কত ভালবাসি মিনি, জানিস্? তুই যে আমার বড় আদরের বোন্। শুধু তোকে লক্ষ্য করে আমি সকল জ্বালা ভুলে আছি। মায়ের শেষ কথাটি আমি ভুলিনি,—"মিনিকে ভালবাসিস্, মিনিকে তোর হাতে সঁপে গেলাম!" মায়ের সে অনুরোধ রক্ষা করেছি। তোকে মানুষ করেছি। আর আমার কিছু সাধ নেই, নারীর কল্যাণের জন্য এ ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। আজ আমি বড় ক্লান্ত। বিজয় ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা হয়েছে মিনি?"

—"হাঁ দিদি তিনি ত কলোম্ব পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন।"

—"হাঁ, বোন, আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম। আমার একটা সাধ কি বাকী আছে, জানিস্? বাংলা ছেড়ে সুদূর প্রবাসে পড়ে আছি, শুধু তোকে মানুষ করে বাংলার কোলে ফিরিয়ে দেবার জন্য।"

—"দিদি, তুমি কিছু ভেবো না। তোমাকে আরোগ্য করে না উঠাতে পারলে এতকাল আমি কি শিখে এলাম্।"

—"বোন্ আমার, তাঁর কাছে বৃথা বিদ্যার অভিমান খাটে না। জীবনীশক্তি যার ফুরিয়ে এসেছে, যার জীবনের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তার বেঁচে থেকে ফল কি? তাঁর উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত কর। যাকে বাঁচতে হবে তার জীবনের ভার বিশ্ব-পিতা আপন হাতে নিয়েছেন; আর যে, এই শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে আর বাঁচতে চায় না, তাকে শান্তিতে মরতে দাও। আমি নিজের জন্য কোন দিন ও কিছু ভাবি নাই। আমি ভাবছি শুধু তোর জন্য। তুমি আমার উপযুক্ত ভগিনী। মরণ পথের পথিক হয়ে বসে আছি. আমায় স্পর্শ করে শপথ করো, বাংলার নারী সমাজের মঙ্গলের জন্য আজীবন চেষ্টা করবে। আর এক কথা.

তোমার প্রিয়বন্ধু মিস্ ফ্লোরেন্স নিউইয়র্ক থেকে আমায় চিঠি লিখে-ছিলেন,—বিজয়ের প্রতি তোমার—"

এমন সময় বিজয় সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

—"ঠাকুরপো, আমি আজ মরণ পথের পথিক। শপথ করো তোমরা দুজনে আমায় স্পর্শ করে, যে আমার প্রতিষ্ঠিত নারীহিতৈষিণী-ব্রত আজীবন পালন করবে। আমি মৃত্যুর পর পারে দাঁড়িয়ে তোমাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখে ধন্য হব। মিনিকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম। মিনি তোমার। আমার মায়ের শেষ অনুরোধ;—মিনিকে আদর যত্ন করো।" মিনি মায়ের বড় আদরের সন্তান। মিনি, বিজয় ঠাকুরপোর হাতে তোকে সমর্পণ করলাম। সুখী হও তোমরা দাম্পত্য-জীবনে, এই আশীর্ব্বাদ করি এখন আমি সুখে মরতে পারব।'

—"বৌদি, তোমার আদেশ শিরোধার্য্য।"

"দিদি—"

"বোন—"

অপমানিতা

জুলিয়ার সাথে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমার বয়স বারো আর তার নয়। প্রাকৃতিক শোভা সম্পদের প্রতি আমার বরাবর আসক্তি ছিল। সুদূর আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে দাদা কাঠের ব্যবসায় করিতেন; তিনি বাড়ী আসিলেই তাঁহার নিকট পার্ব্বত্য অঞ্চলের নৈসর্গিক দৃশ্য ও সে দেশের অধিবাসীদের কাহিনী প্রবল আগ্রহের সহিত শুনিয়া যাইতাম এবং সে দেশে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইতাম। দাদা আমাকে কত রকম ভয়ের কথা বলিয়া বাধিয়া যাইতেন। কিন্তু অনাবৃত প্রকৃতির ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য আমার মনটা সর্ব্বদাই আকুলি-ব্যাকুলি করিত। দাদা কিন্তু কিছুতেই আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিতেন না।

সেইবার দাদা বৌদিদিকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া স্থির করিয়াছেন; আমি এই সুবর্ণ সুযোগ কিছুতেই হারাইতে পারি না। প্রথমে মায়ের নিকট কান্না সুরু করিলাম; তিনি বৌদিদির মতামতের উপর আমাকে নির্ভর করিতে বলিলেন। আমিও নাছোড়বন্দ। বৌদির হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলাম। শত হলেও ত বালিকার প্রাণ; সঙ্গীহীন, সমবয়সীহীন, হয়ে সেই কোন্ অজানা অচেনা তেপান্তরের মাঠে পড়িয়া থাকিতে হইবে, আমার মত একটি হাসি-খুসী ছোট্ট দেবর সঙ্গী জুটিলে তাঁর বেশ আমোদেই দিন কাটিবে, ইত্যাদি ভাবিয়াই বোধ হয় তিনিও মায়ের নিকট আমাকে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন।

*   *   *   *   *

সেখানে গিয়া আমি বেশ ছিলাম। এ পাহাড় হইতে ও পাহাড়ে ছুটাছুটি করিতাম; বনের ফুল তুলিয়া বৌদিদি আর আমি মালা গাঁথি-

তাম ও হরিণ শিশুর পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতাম ; ঝরণার জলে স্নান করিতাম, পার্ব্বত্য অধিবাসীদের বসতিতে যাইতাম ; তাহাদের ছেলে মেয়েদের সাথে ভাব করিতাম। বড় সুখেই ছিলাম। পাহাড়ী ছেলে মেয়েরা আমায় 'ভাইয়া' বলিয়া ডাকিত। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে আমায় বড় বেশী ভালবাসিত ; তারই নাম ছিল ফুলিয়া। একটি ফল পাইলে তার অর্দ্ধেক আমাকে না খাওয়াইলে তার তৃপ্তি হইত না। সকাল সন্ধ্যায় আমার সাথে গল্প করিতে না পারিলে, তার দিন কাটিতে চাহিত না। সে ছিল পাহাড়ী সর্দ্দারের মেয়ে। দু-জনে বসিয়া কত কি গল্প করিতাম। কোন কোন দিন যদি তাদের বাড়ী যাইতে আমার দেরী হইত, সে ছুটিয়া আমাদের বাসায় আসিত। বৌদিদি তাকে একদিন বলিয়াছিল, "ফুলিয়া আমাদের নরেনকে বে করবি ?"

ফুলিয়ার মুখ চোখ লজ্জা ও ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তার পর হইতে সে আমাদের বাসায় বড় আসিতে চাহিত না। আমার ও ফুলিয়ার প্রতি আসক্তি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ফুলিয়া না হইলে যেন আমার আর চলে না।

* * * * *

ধূলো খেলায় কৈশোর কাটিয়া গিয়াছে। আমি তরুণ যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছি ; ফুলিয়া তরুণী যুবতী ; কিন্তু আমাদের উভয়ের তেমনই অবাধ মেলা-মিশা, সঙ্কোচের লেশমাত্র নাই। পাহাড়ী মেয়ে সে ; সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ; সেখানে অবিশ্বাস নাই ; আবিলতা নাই। দুর্ব্বল আমি ; যৌবনমদে মাতোয়ারা আমার প্রাণ। ফুলিয়ার স্নিগ্ধ যুবতী মূর্ত্তি আমার প্রাণে একটা ইন্দ্রিয়ভোগ্য কামনার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। ফুল যতদিন আপন মনে ফুটিয়া থাকে, ততদিনই সুন্দর ; তাকে তুলিয়া মানুষ যখন ইন্দ্রিয় সাহায্যে ভোগ করিবার চেষ্টা করে, তখন আর সে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য বা সৌরভ থাকে না।

সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ঝরণার ধারে, ফুলিয়া আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া গল্প করিতেছিল; আমার সমস্তটা দেহ যেন কি একটা প্রাণ-মাতানো মোহের মদিরায় অবশ হইয়া আসিতেছিল; হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিতেই ফুলিয়ার সুন্দর মুখখানা আমার অতি সন্নিকটে পাইলাম। আমি যেন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। মুখ তুলিয়াই ফুলিয়াকে চুম্বন করিয়া ফেলিলাম।

তারপর ফুলিয়ার যে সে কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিলাম, যা' আজও মনে হইলে আমার প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। পরমুহূর্ত্তেই তার একটা বিকট অট্টহাস্যে সমস্ত বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। আমি অপরাধীর মত মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিলাম। ফুলিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক তীব্র চাহনিতে আমার পানে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিল "মূর্খ, ভ্রাতৃস্নেহের কি এই প্রতিদান? যে ভালবাসা ও স্নেহমমতা ভাইবোনের দাবী, তার বেশী কিছু তুই প্রত্যাশা করতে পারিস্‌নে। বড় ভালবাসতাম তোকে—ভাইয়া,—কিন্তু—নাঃ—"

বন্যার জলের মত ঝর ঝর করে, আমার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ দুইজনেই নীরবে বসিয়া রহিলাম। ফুলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আবার আমার মনে পাপ লালসা জাগিয়া উঠিল। ভ্রান্ত আমি, ফুলিয়াকে ভুল বুঝিলাম। আবার আমি তার নিকট অবৈধ প্রণয়ের প্রস্তাব করিলাম।

—ফুলিয়ার সেই সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি দানবীরূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সরলা শৈলবালা এতটা উত্তেজিতা হইয়া উঠিয়াছিল যে মুহূর্ত্ত মধ্যে তার কটিদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া আমাকে আঘাত করিল; আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। ফুলিয়া একটা পৈশাচিক অট্টহাস্যে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

এই ঘটনার তিন দিবস পরে আমি চেতনালাভ করিয়া দেখিলাম যে, জনৈক নাগা সন্ন্যাসীর পর্ণ কুটীরে আমি শায়িত। পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি নাই। পর্য্যটক সন্ন্যাসীদের সাথে কখনও বা স্থূলদেহে কখনও বা সূক্ষ্মদেহে হিমালয়ের পাদদেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। সুদীর্ঘ ত্রিশবৎসর সন্ন্যাসীদের নিকট যোগ সাধনা করিয়া আমি এমন অবস্থা লাভ করিয়াছি যে আজ পাহাড়ী মেয়ের শাণিত ছুরিকাঘাতের অনেক বাইরে, আজিকার 'আমি' অবধ্য, অবিনশ্বর, চির অমর ; জরা, মৃত্যু, ঘাত, প্রতিঘাত এ 'আমিতে' প্রবেশ করিতে পারে না।

বিদ্রোহী মন।

"ঠাট্টা করছ, অমল-দা? দেখতে পাচ্ছনা: সারাটা জগতে আজ কি একটা মহা জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। আজ নিদ্রিত নারী শক্তি প্রবুদ্ধ; সব দেশে নারী স্বাধীনতা নিয়ে যখন তুমুল আন্দোলন, তখন প্রাচীন সভ্যতার দেশ, আমাদের ভারত কি পেছনে পড়ে থাকবে? জগতের ইতিহাসের দিকে ফিরে চেয়ে দেখ রাজদণ্ড হস্তে নারীশক্তি।"

—"নারী রাজদণ্ড পরিচালনা করেছেন বটে, কিন্তু আপন শক্তিতে নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে বসেছিলেন মাত্র; ক্ষমতার কোন পরিচয় পেয়েছ নারীর?

"ভুলে গেছ অমল-দা? প্রাচীন ভারতের বীর নারী স্বহস্তে স্বামী-পুত্রকে বীর সাজে সাজিয়ে সমর প্রান্তরে পাঠিয়ে দিতেন; প্রয়োজন হলে অসি করে শত্রু সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করতেও পরাঙ্মুখ হন নি পরাজয় অবশ্যাম্ভাবী হলে পবিত্র 'জহরব্রত' উদ্‌যাপন করে তাঁরা ধর্ম্ম রক্ষা করতেন তথাপি আত্মসমর্পণ করতেন না বা—জগতের কাছে আপনাদের ব্যক্তিত্ব হারাতেন না। নারীর কর্ম্মকুশলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আর কেউ স্বীকার না করলেও ভারত অস্বীকার করতে পারে না। নারীশক্তি ভারতের ত অবিদিত নাই।"

—"প্রতিভা, তুমি ইতিহাসের পাতা খুলে নজির দেখাচ্ছ? চেয়ে দেখ একবার বাংলার অন্দরের দিকে! অধিকাংশ বাঙ্গালী মেয়েদের অবস্থা কত হীন! কত পরমুখাপেক্ষিণী তারা!"

—"কিন্তু তাদের এই হীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতার জন্য কে বেশী দায়ী? পুরুষই কি আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের পায়ে এ লৌহ শৃঙ্খল পরিয়ে দেয় নি? পুরুষই যে ভারত নারীর ভাগ্য বিধাতা। পাছে নারীর অধিকারে পুরুষের স্বার্থের হানি হয়, তাই স্বার্থপর পুরুষ, অতি সন্তর্পণে

নারীকে প্রাচীর ঘেরা অন্ধকার অবরুদ্ধ অন্দরের ভেতর পুরে রেখেছে; সেখান থেকে হঠাৎ বাইরের আলোতে আনতে সাহস পাচ্ছেনা; জগতের মুক্ত আলো-বাতাস যে নারীর পক্ষেও পুরুষের মতই সমান প্রয়োজনীয়, সে কথা যেন পুরুষ ভাবতে পারে না; ভাবতে গেলে আঁতকে উঠে। নারীর সৃষ্টি যেন শুধু ঘরকন্নার জন্য; ঘরের বাইরে ও যে তার কর্ত্তব্য আছে, অধিকার আছে, সে কথা যেন অনেকে মানতেই চান না। নারী শুধু ঘরের কোণে বসে থাকবে, পুরুষের মন জুগিয়ে চলবে, যেন পুরুষের মনস্তুষ্টির জন্যই তার জন্ম! শতবার লাঞ্ছিতা, অপমানিতা হলেও পুরুষের পদলেহন করে থাকতে হবে,—পুরুষ ভ্রষ্টাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্নীতিপরায়ণ হলেও স্ত্রীকে তার অনুগতা দাসী হয়ে থাকতে হবে, তাকে নাকি দেবতা বলে পূজো করতে হবে—রক্ত মাংসের দেহধারিণীর পক্ষে এত নির্য্যাতন সহ্য করা সম্ভব বলে মনে হয় না—ভারতের নারী ত মানুষ।"

—"তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে গেছ প্রতিভা। পুরুষের প্রতি এমন বিদ্রোহীভাব কবে থেকে? কোন ব্যক্তিগত অপরাধ আছে কি?"

—"শুধু, ব্যক্তিগত নয়—জাতিগত। সমস্তটা জগত যখন নারীর অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছে, তখন শুধু তোমরা কেন প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়ে থাক? ধর্ম্মের নামে দোহাই দিয়ে হিন্দুসমাজ নারীর উপর কত অত্যাচার করছে, একবার ভেবে দেখেছ কি? সমাজ শাসন করতে হলে নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। সংসারানভিজ্ঞা বালিকা, যে পুতুলের সাথে খেলা করে বেড়ায়, তাকে অপরিণত বয়সে পরের হাতে সঁপে দিয়ে পুণ্য অর্জ্জন করছ,—আর সেই স্বামীজ্ঞানহীনা অবোধ বালিকা বিধির বিড়ম্বনায় যদি বিধবা হয়, তাকেও নাকি আজন্ম কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে; তার জীবন যৌবনের সমস্ত সুখশান্তি নাকি সেই পরলোকগত পুরুষটির চিতাভস্মের সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জ্জন দিতে হবে। তার নাকি উৎসবে, আমোদে যোগ দিতে নেই, কারো সাথে

মিশতে নেই ; শুভকার্য্যে তার নাকি অধিকার থাকে না। হায়, সমাজ আমাদের, ভাব একবার অমল-দা, অবলা বালিকার প্রতি প্রবল সমাজের অত্যাচারের কথা। জগৎ এতটা সইবে কেন? ভারতের সেদিন বুঝি খুব বেশী দূরে নয়, যখন বাধ্যতামূলক বাল-বৈধব্য আর থাকবে না। আর এক কথা, দেখ, অশীতিবর্ষীয় লোলচর্ম্ম পলিতকেশ বৃদ্ধ অবলীলাক্রমে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ (?) করে তার জীবনের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল করে দেয় অথবা পুরুষ একটির পর একটি ক্রমাগত দার পরিগ্রহ করচে, সমাজ কিছু বলে না। কেননা সে যে পুরুষ ; পুরুষের বুঝি ধর্ম্ম নষ্ট হয় না? ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হয় না? যত অত্যাচার শুধু নারীর প্রতি। পুরুষ বুঝি আর অমঙ্গল হতে পারে না। বিন্দুমাত্র কলঙ্ক রটলে নারী ভ্রষ্টা, আর পুরুষ শত কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েও সমাজের নিকট ক্ষমার্হ। যারা নিজেদের একটা বিরাট জাতিকে এমনভাবে নির্য্যাতন করতে পারে, বাইরের জগতের কাছে তারা কি প্রত্যাশা করতে পারে, বল।”

—“কিন্তু প্রতিভা, যাঁরা সমাজের আইন-কানুন গড়ে গেছেন, তাঁরা সব মহানুভব ব্যক্তিই ছিলেন। তাঁদের ভেতর সঙ্কীর্ণতা ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে কতকটা সঙ্কীর্ণতা সমাজে প্রবেশ করেছে সত্য ; কিন্তু সামাজিক প্রত্যেকটা বিধান যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয়।”

—“না অমল দা, তাঁরা সব মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন না। আমি কিছুতেই তা স্বীকার করতে পারি না। তাঁরা ত মানুষই ছিলেন! দেবতা ত না। সমাজের এই সব আইন কানুন গড়বার সভায় যদি নারীর—অধিকার থাকত, তবে এক তরফা এই সব আইন কখনই অনুমোদিত হতে পারত না। তাই আজ নারী তার চিরন্তন অধিকার দাবী করেছে।”

—“দেখো, তোমরা ভাবপ্রবণ জাতি ও স্বভাবতঃ কোমল স্বভাবাপন্না।

রাজ্যশাসন বা সমাজশাসন করতে যে কঠোরতার প্রয়োজন, সেটুকু তোমাদের আছে কি? কঠোরতার নামে যে তোমরা শিউরে উঠ। অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে শুনলে তোমরা যে অশ্রু সম্বরণ করতে পার না।”

—“অমল-দা, কঠোরতাই কি মনুষ্যত্বের পূর্ণতম বিকাশ? ভগবানের কথা ভাব একবার! কত বড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর তিনি! পাপীকে তিনি একহাতে শাস্তি দেন, আর একহাতে আশীর্ব্বাদ করেন, আদর করে কোলে তুলে লন। আমাদের সভ্য জগতের আদর্শ ও কি, —সকলকে শাস্তি এবং আলোকের পথে টেনে নেওয়া নয়? পুরুষ ও নারীর সমবেত শক্তিতে সমস্তটা মানবজাতি অনুপ্রাণিত হবে না কি? তোমরা আজ আমাদের এমন এক স্থানে এনে ফেলেছ, যেখান থেকে আমাদের বাঁধন ছিঁড়ে দিলে ও আমরা আপনারাই আবার সে বাঁধনে জড়িয়ে যাচ্ছি। এতকালের সংস্কার; প্রাচীর ঘেরা বদ্ধ জীব! কিন্তু অমল-দা, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নারীশক্তি জাগ্রত হলে, তার মত ভয়ঙ্করী শক্তি আর কিছু হতে পারে না।

—“হাঁ বক্তৃতা ত খুব দিই, নারীসমাজকে টেনে তোলবার মত কেন উপায় উদ্ভাবন করেছ কি? তাই ত বলেছিলেন, তোমরা বড় ভাবপ্রবণ! কল্পনায় কত সুখের স্বপ্নই না দেখছ—”

—“অমল-দা, আমি কি করেছি বা না করেছি, তা জানবার জন্য আজ পর্য্যন্ত কোনও চেষ্টা করনি কি করে জানবে বল? কিন্তু মনে রেখো, অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত এ ক্ষুদ্র শক্তি নারীর কল্যাণের জন্য ছুটে যাবে। সমাজের ভ্রুকুটির দিকে আর ফিরে তাকাব না। গণ্ডীর বাঁধন ভেঙ্গে সঙ্কীর্ণ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জগতের মুক্ত প্রাঙ্গণে ছুটে বেরিয়ে পড়ব। দেখি, জগত আমাদের পশ্চাতে শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কি না? শুধু—ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে আর চলবে না ছেলে

ভবিষ্যতে অর্থ উপার্জ্জন করবে সেই প্রলোভনে ঘর বাড়ী বাঁধা দিয়ে পর্য্যন্ত তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু বড় আক্ষেপের বিষয় যে মেয়ের শিক্ষার জন্য এক কপর্দ্দক ব্যয় করতে ও অনেকে কুণ্ঠিত। জগতের সৃষ্টির জন্য যারা দায়ী তাদের প্রতি এ অবহেলা কেন? মায়ের জাতিটাকে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষিতা করলে সবটা জাতি উপকৃত হয় নাকি?"

—"তাইত প্রতিভা সব অধিকারের শ্রেষ্ঠ অধিকার যে তোমাদের মাতৃত্ব। নারীর মাতৃত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন।"

সমাপ্ত।

শারদ-লক্ষ্মী



দুই বৎসর বিলাত প্রবাসের পর অক্সফোর্ডের বি-এ, উপাধি নিয়া রমানাথবাবুর একমাত্র কন্যা নীলিমা যখন দেশে ফিরিয়া আসিল, বৃদ্ধ পিতা স্নেহভরে বিজয়ী কন্যার কপোল চুম্বন করিয়া তাহাকে সাদরে গৃহে তুলিয়া নিলেন। কিন্তু প্রতিবেশীরা ইহা আনাচার ভাবিয়া ততটা পছন্দ করিতে পারিলেন না, অবশ্য তাঁহারা প্রকাশ্যে রমানাথবাবুকে এ বিষয়ে কিছু বলিতে সাহস করেন নাই; কেননা, রমানাথবাবু ধনী, জ্ঞানী ও প্রবীণ লোক; সময়ে অসময়ে পাড়া প্রতিবেশীরা তাহার নিকট হইতে যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়া থাকেন। তথাপি চারিদিকে কানাকানি ঘুষাঘুষি হইয়া বেশ একটু জটলা পাকাইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন ছিল বিজয়া দশমী, বাংলার জাতীয় মহোৎসব দুর্গোৎসবের শেষ দিন। রমানাথবাবুর দরদালানে মহাড়ম্বরের সহিত মায়ের পূজা সম্পন্ন হইত। নীলিমা মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের কুশল প্রশ্নাদির পর কাপড় জামা পরিবর্ত্তন করিয়া স্নানান্তে গরদের লালপাড় সাড়ী ও জামা পরিধান করিল এবং জননীর সাথে চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া ভক্তিভরে দেবী প্রণাম করিল। পার্শ্ববর্ত্তিনী মহিলারা এ ওর দিকে তাকাইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রমানাথবাবু কন্যাকে সঙ্গে করিয়া প্রতিবেশীদের প্রত্যেকের বাড়ীতে ঘুরিয়া আসিলেন; নীলিমা পূজনীয়দের প্রণাম করিল, স্নেহ ভাজনদের আশীর্ব্বাদ জানাইল। রমানাথবাবুর বাড়ীতেও

পূজোপলক্ষে বহু আত্মীয় কুটুম্বের সমাগম লইয়াছিল। নীলিমার ব্যবহারে সকলেই বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

দেবী ভাসান ও বিসর্জ্জনের পর রমানাথবাবুর পূজামণ্ডপ প্রাঙ্গনে যখন সকল আত্মীয় কুটুম্ব ও পাড়া প্রতিবেশীরা 'শান্তিজল' গ্রহণের জন্য একত্রিত হইয়াছেন, তখন নীলিমা ও অন্যান্য মেয়েদের সাথে সেখানে উপস্থিত হইল। নীলিমার এক বৃদ্ধা মুখরা পিসিমা তাহাকে বলিয়া উঠিলেন,—"হারে নীলিমা, তুই নাকি বিলেত থেকে ফিরে এলি? তোর যে দেখ্‌ছি কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নি। আমাদের আগেকার সে-ই নীলিই আছিস্।"

"তা নয়ত কি হ'তে বল্‌ছ পিসিমা?"

"না—বল্‌ব আর কি, আমরা ভেবেছিলাম, বিলেত থেকে পাশ করে এলি, না জানি কেমন ধারা মেমসাহেব হয়ে গেছিস্। এই ত সেদিন ঘোষেদের সেজ ছেলে ব্যারিষ্টারি পাশ ক'রে বিলেত থেকে এল। ও বাবা, সে কি ভড়ং! সে কি আর সে ছেলে আছে; পুরোদস্তুর সাহেব বনে গেছে। অবশ্যি গাঁয়ে এসে আমাদের বাড়ী বাড়ী যেয়ে দেখা করে এসেছে; কিন্তু হ্যাট্‌কোট, প্যাণ্ট পড়ে, পুরোদস্তুর সাহেব সেজে, সেই বোশেখ মাসের হাড় ফাটা রোদ্দুর; সারাদিন গরম মোজা, জুতো, জামা ও প্যাণ্ট পড়ে বসে থাক্‌ত; ঘর থেকে এক পা বেরুতে হলে টুপি মাথায় না দিয়ে সে বেরুত না। টেবিল, চেয়ারে, কাটা চামচা দিয়ে আহার করত; আর আমাদের দেশী রান্না ত তার মোটেই রুচ্‌ত না, পিঠে পুলির নাম শুন্‌লে সে হেসে আকুল হ'ত; বল্‌ত—'ও আবার কি জিনিস?' খান্‌সামা বাবুর্চ্চি রেখে চপ্ কাট্‌লেট, কালিয়া, কোরমা, পুডিং আরও কি সব তৈরী করিয়ে সে খেত। বাড়ীর মেয়েদের সাথে কথা বল্‌তে বল্‌তে অনর্গল ইংরেজী

কে যেত ; মেয়েদের যখন কিছুতেই বোধগম্য হ'ত না, তারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্ত ;—তখন তার চমক ভাঙ্গত যে এরা বাংলার বাঙ্গালী পুরবধূ, ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞা ; সে তখন তার ইংরেজী কায়দায় ক্ষমা চাইত—"হাঁ তাইত বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিল, তোমরা কিছু মনে করো না ; অনেকদিন বিলেত থেকে এই যে একটা অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে, এ শোধরাতে কিছু সময় লাগ্‌বে।' তবে বিলেত গিয়ে তাকেও দুবছরই থাক্‌তে হয়েছিল। তা ছাড়া, তার ত আর গুরু লঘু জ্ঞান ছিল না ; কা'কে যে কি বল্‌ত, তার আর মাথা মুণ্ডু নেই।"

—"এ সব অবশ্য কতকটা বাড়াবাড়ি, পিসিমা, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে যে নারী আর পুরুষে বিশেষ করে তফাৎ ওখানেই। অবস্থার পরিবর্ত্তনটা নারী যত সহজে সাম্‌লে নিতে পারে, পুরুষ তা বুঝি পারে না। জল যেমন সহজে গরম হয় না, কিন্তু একবার গরম হ'লে তা ঠাণ্ডা হ'তে বহু সময় নেয়, তেমনি পুরুষ অতি সহজে পারিপার্শ্বিক ও সমসাময়িক ব্যাপার গুলোকে গ্রহণ করে না, কিন্তু একবার যখন গ্রহণ করেছে, তখন সে পরিবর্ত্তনটা সহজে উপড়ে ফেল্‌তেও পারে না বা ফেলে না। জোয়ারের স্রোতে ভাসমান তৃণ খণ্ডের মত একবার গা ভাসিয়ে দিয়ে অনেকটা দূর একটানা স্রোতে এগিয়ে চলে যায়, ফিরে তাকাবারও অবসর থাকে না ; কিন্তু মাটির ধর্ম্ম কি পিসিমা ? মাটি অতি সহজে উত্তপ্ত হয়ে উঠে, আবার উত্তাপের অভাবে অতি দ্রুত ঠাণ্ডাও হয়ে যায় ; যেমন ছিল তেমনি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নারী আমরা, অনেকটা মাটির স্বভাবাপন্না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাকে যেমন সহজে বরণ করে নিতে পারি, অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাকে দূরে ঠেলে ফেল্‌তেও অতি

সহজে আমরাই পারি। তা নইলে আজন্ম পিতৃগৃহে প্রতিপালিতা কিশোরী বা তরুণী অমন সহজে শ্বশুর গৃহের নূতন আবহাওয়াকে আপনার করে নিতে পারত না।"

—"তা, তুই যাই কেন বলিস্ না, নীলিমা, তোকে যে আমরা এমন সহজ ভাবে দেখ্‌তে পাব, তা কখনও মনে করি নি। তোকে নিয়ে পান্‌সী নৌকাখানি যখন ঘাটে ভিড়ল, পাড়ার ছেলে মেয়েরা ছুটে দেখ্‌তে গিয়েছিল, তাদের নীলিদিদি কেমন গাউন পড়ে মেম সহেব হ'য়ে এসেছে!"

—"তাই নাকি? দেখো পিসিমা, দু'বছর প্রবাসে থেকে মানুষের এমন কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত নয়, যাতে তার আশৈশবের স্মৃতি ও অভ্যাস গুলি নষ্ট হ'তে পারে।"

—"তা তোর মত বুদ্ধিমতী ত সবাই নয়। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে সেই খৃষ্টানের দেশ থেকে এসেও দেবদেবীর প্রতি তোর অচলা ভক্তি দেখে আমরা আরও আশ্চয্যি হ'য়ে গেছি।"

—"আশ্চয্যি হওয়ার মত কি আছে পিসিমা? হিন্দুর ঘরের মেয়ে আজন্ম হিন্দু অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠাবতী। তোমরা জান না, বিলেত প্রবাসকালেও সেখানে আমি আমাদের ধর্ম্ম পুস্তকগুলি বিশেষরূপে অধ্যয়ন ক'রতাম। সেখানে অনেক গুলি মহিলাসমিতি আছে। দুই তিনটি শক্তিশালী মহিলা সমিতিতে আমি ধারাবাহিকরূপে বেদবেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতাম। হিন্দু দেবদেবী পূজার স্বার্থকতা কোথায়;—নারী শক্তি ভারতে একদিন কত বড় শক্তি ছিল; আয্যঋষিগণ কি ভাবে নারীর ভেতর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী ভগবানের মহাশক্তির বিকাশ উপলব্ধি করেছিলেন; কি ভাবে বিশ্বের জননী আদ্যাশক্তি দুর্গাদেবীর রূপ কল্পনা, ধারণা ও সাধনা

বৈদিক ঋষিদের ধ্যানের বস্তু ছিল, এসব বিষয়ে কতিপয় ধর্ম্ম প্রবণ বিদুষীমহিলার সাথে আমার সর্ব্বদা আলোচনা হ'ত।

এমন সময় নীলিমার এক খুল্লতাত বলিয়া উঠিলেন,—"নীলিমা, তুমি আমাদের বংশের গৌরব ; আমরা বয়োবৃদ্ধ হ'লেও জ্ঞান বৃদ্ধা তুমি ; কিন্তু বৈদিক ঋষিগণ কি ক'রে দুর্গাদেবীর ধ্যান কর্‌তেন? আর উপনিষদের বাণী কি শুধু দেবদেবীর কল্পনায় পর্য্যবসিত—না আরও কিছু উদার মহান্ বাণী তার ভেতর আছে? আমরাও এসব পুঁথি একটু আধটু নাড়া চাড়া ক'রে থাকি মা।"

—"খুড়োমহাশয়, যদি তর্ক কর্‌তে নেমেছেন, রূঢ় কথার জন্যও প্রস্তুত থাকবেন। বেদের মূলসূক্তগুলি কখনো পড়েছেন কি? ঋক্‌বেদের খিলসূক্তে সর্ব্বপ্রথম দুর্গাদেবীর উল্লেখ আছে।

"স্তোষ্যামি প্রযতে দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচ প্রিয়াম্
সহস্র সম্মিতাং দুর্গাং জাত বেদসে সুনবাম্ সোমম্।"

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্ম ফলেষু জুষ্টাম্
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ।"

তারপর ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে দেবীর ক্রম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তন্ত্র ও পুরাণে বিশদ্ ব্যাখ্যা আছে।"

—"তা, মা সংস্কৃত মূল গ্রন্থ আমার পড়া নেই বটে ; এই যা এদিক্ সেদিক্ পড়েছি মাত্র। মনে কিছু করো না মা।"

দেখুন এসব বিষয় আলোচনা কর্‌তে আমি বেশ আনন্দ পাই। তর্ক না কর্‌লে মানুষ প্রকৃত সত্যের সন্ধানও পায় না। আর এই

উপনিষদ্; এ হ'চ্ছে জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রত্ন। বৈদিক যুগে যখন বহুদেবতার কল্পনা হ'ল এবং যাগ্‌যজ্ঞেই সাধারণ মানুষের ধর্ম্মের পরিণতি হ'য়ে দাঁড়াল তখন উপনিষদের ভিতর দিয়ে ভগবানের উদার বাণী জগতে প্রচারিত হয়েছিল। উপনিষদের আধ্যাত্মতত্ত্ব অনুশীলন করে আর্য্য ঋষিগণ সেই অদ্বিতীয়, সনাতন পরমব্রহ্মের সত্তা জগতের প্রতি অনু পরমাণুতে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি কর্‌তেন। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যত রকম ভাবধারা জগতে প্রচারিত হয়েছে, তারমধ্যে উপনিষদের ভাব অতি উদার ও বিশ্বজনীন।"

নীলিমার এই সব বক্তৃতা শুনিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুর একটু অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিমুহূর্ত্তেই আশঙ্কা হইতেছিল, কখন সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী, নীলিমা ধর্ম্মের জটিল প্রশ্ন নিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। তিনি অধৈর্য্য হইয়া রমানাথবাবুকে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখুন, রমানাথবাবু শান্তি জলটা দেওয়া হয়ে যাক্, অনেক রাত হয়ে গেল। এসব আলোচনা পরেও ত চল্‌তে পারে।"

—"আচ্ছা তাই হোক্; দেখ নীলিমা পুরোহিত ঠাকুর একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন; তাঁর কাজটা বরং সেরে যেতে দাও।" এই বলিয়া তিনি নীলিমার উত্তরের প্রতীক্ষা করিলেন।

—"না বাবা, ঠাকুরমশায়ের অমন ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে কেন? ওঁর কাছে আমাদের যে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। দেখুন ঠাকুরমশায়, দুর্গাপূজা আমরা বৈদিক অনুষ্ঠান বলে মনে করে থাকি। কি ভাবে বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞের ভেতর থেকে আর্য্য ঋষিগণ এ পূজার প্রবর্ত্তন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনার মতটা জান্‌তে পারি কি?

—"তা মা আমার ত এসম্বন্ধে ততটা জানা নেই তবে আমাদের

পণ্ডিত ঠাকুর ঐ যে দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছেন, উনি অবশ্য তোমাদের এ বিষয়ে একটা ব্যাখ্যা দিতে পারেন। আমরা জানি, শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি পূজার পর থেকে ভারতে শরৎকালে দেবীর বোধন হয়ে থাকে।"

—"হাঁ, সে ত নেহাৎ মামুলী কথা। কিন্তু বেদে যে আমরা দুর্গাদেবীর উল্লেখ পেয়ে থাকি; সেই দেবীর প্রতিমা পূজা আর্য্য ঋষিদের মধ্যে কখন কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল?"

—"তা, তা হ'লে ঐ যে পণ্ডিত মশায় চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছেন; ওঁকে ডেকে আনি। উনি এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানী, আমার ততটা—" এই বলিয়া এক পা দুই পা করিয়া তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন।

—"হাঁ, বাবা এরা যে শাস্ত্রের কিছু জানে না।"

—"তা ত হবেই মা; এরা হচ্ছে নেহাৎ তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছে, এই মাত্র তাদের দাবী। বিদ্যে বুদ্ধি নেই, জীবিকা উপার্জ্জনের এই প্রকৃষ্ট উপায় ধর্ম্ম প্রবণ হিন্দুর বাড়ীতে পূজা পার্ব্বণ ব্রতানুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করে থাকে। পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি ও শিক্ষা দীক্ষায় পূজা পার্ব্বণের অনুষ্ঠান গুলো এদের বেশ জানা আছে। হিন্দুর পূজা পার্ব্বন যাগযজ্ঞ সবটাতেই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন; অনুষ্ঠান আরাধনার অঙ্গ। এরা আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মে সাহায্য করে মাত্র। দেবতার অর্চ্চনা করেন যজমান, পুরোহিত তার সাহায্যকারী বেতনভুক্।"

—"কিন্তু বাবা, অনেকস্থলে পূজার মন্দিরে পুরোহিতেরই যে একচেটিয়া অধিকার দেখ্তে পাই। সেখানে যেন যজমান্ কিছু নয়, পুরোহিতেরই সব; যেটুকু অধিকার দেওয়া হয়, সেটুকু যেন তার অনুগ্রহ।"

—"না, মা এ তোমার একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা। পুরোহিতের সেখানে কোন অধিকার নেই; সব অধিকার তোমার, তবে এই যে একটা বিকৃত অবস্থা সমাজে আজ দেখ্‌ছ, তার পশ্চাতে রয়েছে ঘোর স্বার্থপরতা, অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য ও একনিষ্ঠার অভাব, যে মহান্ আদর্শ লক্ষ্য করে হিন্দুর দেবদেবীর অর্চ্চনা হয় সে ভাবটা উপলব্ধি কর্‌বার চেষ্টা বর্ত্তমান যুগে কয়টা হিন্দু করে থাকেন? এই অনুষ্ঠানগুলির ভিতর আন্তরিকতার সহিত প্রবেশ করবার মত শিক্ষা দীক্ষা কয়টা লোকের আছে বল ত? অথচ অহঙ্কারোন্মত্ত সেই সব ব্যক্তি অতি ক্ষীণ অভিজ্ঞতা ও বিকৃত জ্ঞানের দোহাই দিয়ে সমাজ সংস্কার ও ধর্ম্ম সংস্কারে ব্রতী। আজ যে পুরোহিতের একচেটিয়া অধিকার একটা দেখছ দেবতার মন্দিরে সেজন্য দায়ী তুমি, দায়ী আমি, দায়ী অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন এই দুর্ব্বল ও স্বার্থপর সমাজ। পুরোহিত সেখানে ধর্ম্মের নামে জীবিকা অর্জ্জন করছে—পুত্র পরিবার প্রতিপালন করছে, ধর্ম্মের নামে বিলাসিতার উপকরণ যোগাচ্ছে, অজ্ঞ জনসাধারণ। হাঁ, একদিন ছিল, ব্রাহ্মণের একনিষ্ঠা স্বার্থত্যাগ ও পরোপকারিতা; সেদিনে সে অধিকারও করেছিল সমাজের বরেণ্য স্থান। কিন্তু স্বার্থের মোহে ভারতের সমাজ, ভারতের বরেণ্য, সনাতন ধর্ম্ম আজ বিকৃত। সেদিনের ব্রাহ্মণ পরার্থপরতায় ও সমাজ শিক্ষায় জীবন উৎসর্গ কর্‌তে জান্‌ত; সেদিন শুধু ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হত না, সুকর্ম্ম ও সাধনার দ্বারা অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের পদে উন্নীত হ'ত, কুকর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে পরিণত হত।"

"আচ্ছা, বাবা তুমি ত সর্ব্বদা তন্ত্র পুরাণ, বেদ, উপনিষদ, অধ্যয়ন করে থাক। তোমার নিজের মতানুসারে দুর্গাপূজার একটু ছোট্ট ইতিহাস আমাদিগকে বল দেখি নি?"

—"সে যে কত যুগযুগান্তের কথা, যা ইতিহাস সাক্ষ্য দিতে পারে না, স্মৃতি ধারণা কর্‌তে পারে না—যখন ভারতের পুণ্য তপোবনে জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়েছিল। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উজ্জ্বলালোকে ভারতের নরনারীর প্রাণ প্লাবিত করে দিয়েছিল। বৈদিক ঋষিগণ হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে সেই অগ্নি শিখার সম্মুখে বসে অনাদি, অনন্ত বিশ্বনিয়ন্তার ধ্যান কর্‌তেন। তাঁরা কেউ বা অগ্নিকে, কেউ বা জলকে জগতের শক্তির আদি বলে কল্পনা করেছিলেন। আজ ইউরোপের উন্নত সভ্যতা ও বিজ্ঞান আবিষ্কার কর্‌তে চলেছে 'ইলেক্‌ট্রন্' যা নাকি জগতের প্রত্যেক পদার্থের মূল উপাদান বা শক্তি। জগতে আমরা যা কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি তারই আদি শক্তি নাকি ঐ 'ইলেক্‌ট্রন্'; পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিমাণ, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে সেই সূ-সূক্ষ্ম 'ইলেকট্রন' জগতকে নাকি অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারিণী করে রেখেছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে দেখতে পাওয়া যাবে যে লোহা আর সোণাতে পরমাণুগত প্রভেদ কিছুই থাকে না; বৈজ্ঞানিকের এই মহাসত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে আমরা আবার নূতন ভাব ধারার ভেতর দিয়ে বিশ্বশক্তির একত্ব উপলব্ধি কর্‌তে পারব।"

—"হাঁ বাবা তুমি যে বিজ্ঞান নিয়ে তোলপাড় কর্‌ছ; আসল কথাই যে দেখ্‌ছি ভুলে গেলে।"

—"না, মা, ভুলি নি। বৈদিক ঋষিগণ যে যজ্ঞবেদীর সম্মুখে বসে উপাসনা কর্‌তেন, সেই বেদীকে তাঁরা দক্ষের কন্যা বলে অভিহিত করেছিলেন; অগ্নি পরিবেষ্টিত সেই বেদী অতি পবিত্র বলে রক্ষিত হ'ত। সে যুগের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস নেই বটে, কিন্তু যতটা জান্‌তে পারা গেছে, তাই থেকে মনে হয়, নারী শক্তি সে যুগে একটা

অতি ভীষণ শক্তি ছিল। নারীর বুদ্ধি কৌশলে ও অমিত তেজা মহিমাময়ী কোন কোন নারীর বিক্রমে দেশ শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ধর্ম্ম এবং শান্তি সংস্থাপনের জন্য ভগবান তাঁর বাণী ও শক্তি নিয়ে যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন; শ্রীকৃষ্ণ, মনু, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, মহম্মদ, যীশুখ্রীষ্ট, এঁরা পরবর্ত্তী যুগে অবতীর্ণ ভগবানের অবতার। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানব সমাজে যখনই উচ্ছৃঙ্খলতা, অত্যাচার ও অনাচার পরিলক্ষিত হয়, তখনই যুগমানব বা অবতারের আবির্ভাব হ'য়ে থাকে। ভারতের প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগে যখন আর্য্য ঋষিগণ মধ্য এসিয়া হ'তে ভারতে অভিযান করেছিলেন, তখন অনার্য্য জাতিদের সাথে তুমুল যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হ'ত। সে সংগ্রামে আর্য্য নারী পুরুষের সাথে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হতেন। হয়ত সেই অতীত যুগে ভগবানের বাণী ও শক্তির বিকাশ হত শৌর্য্য বীর্য্যশালিনী, প্রতিভাময়ী, প্রবল পরাক্রান্ত মহিমাময়ী নারীর ভেতর দিয়ে; বিভিন্ন সময়ে তাঁদের শক্তির প্রভাবে হয় ত মুষ্টিমেয় আর্য্যজাতি অগনিত অনার্য্যে পরিবেষ্টিত এবং আক্রান্ত হয়েও আপনাদের প্রাধান্য বজায় রাখ্তে সমর্থ হয়েছিলেন। তারপর যুগের পর যুগ চলে গেছে, জগতের প্রতি অণুপরমাণু যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে, মানুষের ভাব ধারা, চিন্তাস্রোত ও সাধন পদ্ধতিতে তেমনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হ'য়ে আস্‌ছে। আর্য্যঋষি গণের উপাসনা পদ্ধতিতে ও পরিবর্ত্তন এসেছিল। পরবর্ত্তী যুগে তাঁরা যজ্ঞের অগ্নি নিবিয়ে দিয়ে অগ্নিধৌত সেই পূত যজ্ঞবেদীর সম্মুখে বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হতেন। সেই ধ্যান মগ্ন ঋষিগণের আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যেত; সমাধি ভঙ্গের পর কখন কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে তাঁরা সেই বেদীর উপর পীতবর্ণা, এক শক্তিশালিনী, মহিমাময়ী দেবীর সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন।

আদি শক্তি বিশ্বজননীরূপে তার পূত প্রতিমা যজ্ঞবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। যজ্ঞবেদী বা দক্ষদুহিতা এই দেবী অগ্নি পরিবেষ্টিতা হয়ে থাকতেন বলে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগে তাঁকে রুদ্রাণী বা শিবানী বলে কল্পনা করা হয়। বহু যুগ যুগান্ত সাধনার পর আর্য্যঋষিগণ মহাগ্নি বেষ্টিত বেদীর ভিতর যে সত্য রূপ উপলব্ধি করেছিলেন, সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয়কারিণী, মহাশক্তি বিশ্বজননীর সেই রূপ। বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরে এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগে এই দেবী যথাক্রমে উমা, অম্বিকা, দুর্গা, কালী, করালী, হৈমবতী, কাত্যায়নী, পার্ব্বতী, ঈশানী, রুদ্রাণী, উগ্রচণ্ডী, শিবানী, চামুণ্ডা, ভগবতী, মহিষমৰ্দ্দিনী, ভদ্রকালী, কাপালিনী প্রভৃতি অসংখ্য নামে অভিহিতা ও পূজিতা হ'য়ে আসছেন। রামায়ণ মহাভারতে দেবী পূজার উল্লেখ আছে। রাজা সুরথ রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে এই দেবীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রামচন্দ্র রাবণ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হয়ে নীলোৎপল দ্বারা দুর্গাদেবীর আরাধনা করেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন ষোড়শোপচারে দুর্গার পূজা করতেন। মহাভারতের যুগে দানবদলিনী রূপে ভগবতীর আবির্ভাব হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শক্তির আরাধনা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই বিশ্বজননীর মহাপূজা যে শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়; সমস্ত প্রাচীন সভ্য-জগতে এই দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। মিশর, বেবিলোন, শিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরের কোন কোন প্রাচীন জাতি এই সিংহবাহিনী দেবীকে বিভিন্নরূপে ও নামে পূজা করেছিলেন। শক্তি-পূজার ইতিহাস সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু ব'লবার আছে, অন্য সময়ে তোমাদের তা বলতে চেষ্টা করব।"

—"বাবা, তাহলে এখন শান্তিজল গ্রহণের বন্দোবস্ত করা যাক।"

—"হাঁ মা, তাই করো।"

তারপর গভীর রাত্রে শান্তিজল গ্রহণ করিয়া সকলে এই দেবী-তত্ত্বের ব্যাখ্যা আলোচনা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

(২)

মিস্ নীলিমা বোস কলিকাতা বেথুন কলেজে প্রফেসার। রমানাথ বাবু আজ দু-বৎসর যাবৎ কন্যাকে লইয়া ভবানীপুরে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন। তিন চারি মাস পর এক একবার দেশের বাড়ীতে যাইতেন বটে—কিন্তু কিছুদিন পর আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেন। পূজার সময় তিনি গৃহিণী ও কন্যাকে লইয়া প্রায় দুইমাস বাড়ী যাইয়া থাকিতেন। রমানাথ বাবুর একান্ত ইচ্ছা যে কন্যাকে কোন সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি সস্ত্রীক বারাণসী ধামে যাইয়া বাস করিবেন। কিন্তু সুশিক্ষিতা বিলাত ফেরতা মেয়ে, নীলিমা; তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতেও রমানাথ বাবু সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। অবশ্য গোপনে গোপনে তিনি নীলিমার উপযুক্ত বরের সন্ধান করিতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই—কিন্তু নীলিমা যে প্রকার স্বাধীন-চেতা মেয়ে, সে যে 'হজে স্বামীর অধীন হ'য়ে, কোন পরিবারে বধূ হইতে স্বীকৃতা হইবে,—তেমন কোন আভাষ রমানাথ বাবু নীলিমার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কখনো পান নাই। রমানাথ বাবুর স্ত্রী স্বামীকে কন্যার বিবাহের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত করিতেন অথচ নীলিমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া নীলিমার মা কখনও আশাপ্রদ উত্তর পাইতেন না। কিন্তু নারীর প্রাণ, বিশেষতঃ মায়ের প্রাণ, কন্যার অভাবটা বেশ অনুভব করিতেন।

রমানাথ বাবু কলিকাতা আসিয়াই একখানা মেটের গাড়ী ক্রয়

করিয়াছিলেন। নীলিমা কলেজ হইতে ফিরিয়া প্রায় প্রত্যহই পিতা মাতা ও দুই একজন ছাত্রী বা শিক্ষয়িত্রীর সাথে বেড়াইতে বাহির হইত। মাঝে মাঝে তাহারা সিনেমা প্যালেসে বা থিয়েটারেও যাইত। রমানাথ বাবু সেকেলে লোক হইলেও হালের চালচলন ও সভ্যতাটা বিশেষ সম্মান ও গর্ব্বের চক্ষেই দেখিতেন। কারণ তিনি বেশ বুঝিতেন যে, জগত পরিবর্ত্তনশীল, মানুষের রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার মাপকাঠি ও সামাজিক আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইবেই, স্বভাবের এই উদ্দাম গতিকে যে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করে, তাহার মত অর্ব্বাচীন জগতে বিরল। তিনি নিজে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে আব্ হাওয়াতে মানুষ হইয়াছেন, বর্ত্তমানে সেই সমাজের অবস্থা ঠিক বিপরীত না হইলেও তরুণের দিক দিয়া অনেকটা পরিবর্ত্তিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কত ভাব ধারা জগতে আসিয়াছে—কালের উত্তাল তরঙ্গ স্রোতে তা বেশী দিন স্থির থাকিতে পারে নাই; নূতন আসিয়া পুরাতনের স্থান অধিকার করিয়াছে। কালের অনন্ত স্রোতে জগতটা ভাসমান; জোয়ারের স্রোতে ভাসিয়া যে জাতি যত বেশী অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, সে-ই সম-সাময়িক অন্যান্য জাতির চেয়ে তত বেশী উন্নত। আর যে ভাটায় পড়িয়া আছে—নূতন জোয়ারের প্লাবনে যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে নাই, অতীতের সেই ক্ষীণ স্রোতকে আশ্রয় করিয়া যে পঙ্কিলতার ভিতর ডুবিয়া আছে এবং জোয়ারের নূতন জলকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ঘিরিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, জগতের কাছে সেই আত্মঘাতী অপরিণামদর্শী জাতির লাঞ্ছনাও তত বেশী। এই সত্যটা বৃদ্ধ রমানাথ বাবু প্রাণে প্রাণে খুবই অনুভব করিতেন।

বিলাত ফেরত ও আধুনিক এদেশীয় উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় যুবকের সহিত রমানাথ বাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাহারা মাঝে

মাঝে রমানাথ বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রিত হইতেন। নীলিমার সাথেও তাহাদের আলাপ পরিচয় হইয়াছিল; তাহারা সকলেই বিদূষী নীলিমাকে বিশেষ সম্মান করিয়া চলিত। রমানাথ বাবু তাহাদের সাথে নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন; নীলিমাও মাঝে মাঝে যোগ দিত। কিন্তু ধীরে ধীরে বিচক্ষণ রমানাথ বাবু লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপক রমেন্ পালিতের মতগুলি নীলিমা যেমন আগ্রহের সহিত সমর্থন করিত, নীলিমার মতামতও রমেন্ পালিত তেমনি গ্রহণ করিতে সচেষ্ট থাকিত।

রমেন পালিত ধনীর সন্তান ছিলেন বটে, কিন্তু পিতার অমিতব্যয়িতা ও মামলা মোকদ্দমার ফলে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যাওয়াতে, আশৈশব তাহাকে দারিদ্রের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইয়াছিল। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন; কিন্তু বুদ্ধিমতী জননীর চেষ্টা যত্নে এবং নিজের ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি প্রথম শ্রেণীতে এম্-এ পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক পদ লাভ করেন।

যথাসময়ে রমেন পালিতের জননী নীলিমাকে পাকা দেখিয়া গেলেন। রমানাথ বাবু যথোপযুক্ত জাঁকজমকের সহিত একমাত্র কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। গৃহস্থালীর অতি সাধারণ জিনিষ পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বহুমূল্য একখানা মোটরকার অবধি বিবাহে যৌতুক প্রদান করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কন্যা ও জামাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ প্রত্যেকের নামে পাঁচ হাজার টাকা ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া ব্যাঙ্কের পাশবহি ও চেক ইত্যাদি বিবাহের যৌতুকের সহিত বেশ একটা অভিনব উপায়ে সাজাইয়া দেওয়া হয়। বিবাহে বহু গণ্য মান্য ভদ্রলোক ও মহিলাগণের সমাগম হইয়াছিল।

রমেন বাবুর জননী নীলিমাকে একমাত্র পুত্রের সহধর্ম্মিণী রূপে সাদরে আপন গৃহে বরণ করিয়া লইলেন। নীলিমাও স্বামীর সংসারে আসিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা অজানা অচেনা পরিবার ও তৎসম্পর্কিত আত্মীয় কুটুম্বদের অতি আপনার করিয়া লইল। শাশুড়ী নীলিমার আদর যত্নে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সংসারের যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব উপযুক্ত পুত্রবধূর হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বিলাত ফেরতা বিদুষী পুত্রবধূ,—প্রথমটা তিনি একটু আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে হয়ত বধূর মেমসাহেবিয়ানাতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইবে। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ বধূদের চেয়েও তাহার অমায়িক ভাব, গুরুজনের প্রতি অচলা ভক্তি, নিপুণ গৃহিণীপণা দেখিয়া তিনি বিশেষ আপ্যায়িতা হইয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থ বধূদের সহিত তাহার তফাৎ এই ছিল যে সে কখনও সময়ের অপব্যবহার করিত না; সারাদিন শুধু সেই মামুলী ঘরকন্না নিয়াও ব্যস্ত থাকিত না; কিন্তু তাহার নিকট বাঁধা নিয়মে দাসদাসীদের কাজ করিতে হইত; নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন তাহারা অবসর পাইত। নীলিমা নিয়মিত ভাবে নানা বিষয়ে জ্ঞান চর্চ্চা করিত। নীলিমার শাশুড়ীও বিদূষী রমণী ছিলেন। তাহার সহিত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয় নিয়া নীলিমা নানা প্রকার আলোচনা করিত। পাড়ার মেয়েরা তাহার উৎসাহে উৎসাহিতা হইয়া বহুদিনের পরিত্যক্ত ছিন্ন পুঁথি পুস্তক নাড়াচাড়া করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তাহার নেতৃত্বে পাড়ায় সাতদিন অন্তর মেয়েদের একটা বৈঠক বসিত। নীলিমা নিঃসঙ্কোচে সেই মহিলা বৈঠকে বক্তৃতা করিত। মেয়েরা তাহার প্রাঞ্জল আলোচনায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। তাহার ঐকান্তিক যত্নে পাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সেই বিদ্যামন্দিরের বিবিধ স্তরে বাংলা, ইংরেজী,

সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি, সমাজ নীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শরীরতত্ত্ব, রোগীর সেবা, নারীধর্ম্ম, গৃহিণীপণা সন্তান পালন, রন্ধন-প্রণালী, চিত্রাঙ্কণ সঙ্গীতচর্চ্চা ও বিবিধ প্রকার অর্থকরী শিল্পকলা শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা হইতে লাগিল। নীলিমার চেষ্টায় সরকারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের যথেষ্ট সাহায্য লাভে তাহাদের ক্ষুদ্র আয়োজন ক্রমে বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইত। যে সকল বালিকা বধূরা আলো বাতাসহীন অবরুদ্ধ অন্দরের ভিতর পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত দিন দিন জীবনীশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া জাতির দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি করিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহাদের কর্ণে নীলিমার শুভ প্রচেষ্টার বাণী যাইয়া পৌছিল। সমাজের নিপীড়িতা বালবিধবাদের অসহায়, করুণ অবস্থার উন্নতি সাধন নীলিমার জীবনের মহাব্রত হইয়া উঠিল। প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া নীলিমা তাহাদের নানা প্রকার শিল্পবিদ্যা শিখাইতে লাগিল। কাহারও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত হইল। আর যে সকল অভিভাবক অবোধ বিধবা বালিকাদের পুনঃ বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন, তাহাদের জন্য নবপ্রতিষ্ঠান সমূহের মতানুসারে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান চলিতে লাগিল।

বাহিরের এত কার্য্যে যোগ দিয়াও নীলিমা সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর সাহায্য করিত। রমেন বাবু স্ত্রীর কর্ম্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনিও সর্ব্বদা নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। বহু সভা সমিতিতে তাহাকে যোগ দিতে হইত। সন্ধ্যার পর প্রায়ই তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া জননী ও স্ত্রীর সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন রমেন বাবুর সুসজ্জিত শয়ন কক্ষের দুই পার্শ্বে দুই খানা পালঙ্ক ছিল; কোন কোন দিন রমেন বাবুর গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইলে শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া নীলিমা আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইয়া শয়ন করিয়

থাকিত বটে, কিন্তু স্বামী আসিবা মাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহার বিশ্রাম ও আহারাদির বন্দোবস্ত স্বহস্তে করিয়া দিত। তাহাদের কর্ম্মময় জীবনে অভাব কিছুরই রহিল না; কিন্তু নীলিমা তার মাতৃ হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে কি যেন একটা শূন্যতা অনুভব করিত।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত্রি। শরতের ফুটফুটে জ্যোৎস্না পার্শ্বের বাতায়ন পথে নীলিমার সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছিল; নীলিমা তাহার শয্যায় হেলান দিয়া বসিয়া তন্ময় চিত্তে একখানা সাময়িক উপন্যাস পাঠ করিতেছিল; এমন সময় রমেন বাবু নৈশ সৌন্দর্য্যের গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং নীলিমার জ্যোৎস্নাস্নাত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে কি একটা মোহের মাদকতায় তাহার সমস্ত দেহ যেন অবশ হইয়া আসিল; তিনি ধীরে ধীরে নীলিমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন; মন্ত্রমুগ্ধার মত নীলিমা তাহার বিবশ দেহে এলাইয়া পড়িল, উভয়ে এভাবে কত সময় ছিলেন, তা তাঁহাদের স্মরণ নাই। পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর নীলিমা তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল। সাংসারিক কাজ কর্ম্মের সমস্ত বন্দোবস্ত নীলিমাকে করিতে হইত। তা ছাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের নেতৃত্বেও তাহার অনেকটা সময় অতিবাহিত হইত।

নীলিমার পিতামাতা কিছুদিন পূর্ব্বে নীলিমাকে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দান করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশের আয়ে বারাণসী ধামে যাইয়া বাস করিতেছিলেন। নীলিমা মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া অবস্থান করিত। রমানাথ বাবু কাশীধামে বেশ জাঁকজমকের সহিত বাস করিতেছিলেন; অর্থ থাকিলে বর্ত্তমান যুগে পদমর্যাদা বজায় রাখিয়া সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে

বাস করিতে পারা যায়। রমানাথ বাবু সস্ত্রীক বারাণসী ধামে যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সংসারে ধনসম্পদ বা পদমর্যদা কিছুরই তা'র অভাব ছিল না। কিন্তু মানুষের চরম লক্ষ্য পরকাল। ইহ্কালের সুখ সম্পদ বা ধনৈশ্বর্য্যে মানুষ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। যদি তা সম্ভব হইত, তাহা হইলে রাজৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত রাজপুত্র গৌতম রাজ্যসুখ, প্রিয়তমা যুবতী পত্নীও শিশুপুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বনবাসী হইতেন না।

(৩)

নারীর শ্রেষ্ঠ অধিকার মাতৃত্ব গৌরবে নীলিমা আজ গৌরবান্বিতা। সংসারে সমস্ত কর্ম্ম কোলাহল একদিকে আর শিশু পুত্রের সেবা যত্ন আর একদিকে। তাহার হৃদয়ের স্নেহধারা এতদিন যে একটা অজানা অতৃপ্তি দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে ছিল; আজ যেন তা পূর্ণতার স্পর্শে পরিতৃপ্ত। একটি ক্ষুদ্র শিশু নীলিমার কর্ম্মময় জীবনকে যে এমন ভাবে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিবে, ইতি পূর্ব্বে সে তাহা কল্পনা ও করিতে পারে নাই।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে নারীর সর্ব্বজনীন কল্যাণের জন্য নীলিমা বহু আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বের মত সমস্ত প্রাণমন দিয়া সে আর ঐ সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিত না। তাহার কর্ম্মময় জীবনের স্রোতে যেন উজান বহিতে সুরু করিয়াছে। যে কর্ম্মের প্রেরনায় তার উন্মাদ প্রাণ দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল আজ যেন সেখানে জড়তার চিহ্ন দেখা দিয়াছে।

রমেন বাবু তাহার এই উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া একটু অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন; কারণ এই সকল নারী মঙ্গল প্রতিষ্ঠনের প্রতি তাহার

পূর্ণ সহানুভূতি ছিল এবং জাতির মেরুদণ্ড নারীর প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষার উপর যে প্রত্যেক জাতির অনেক কিছু নির্ভর করে; তাহা তিনি প্রাণে প্রাণে খুবই উপলব্ধি করিতেন। তারপর যে ভাবে নীলিমা এই ব্রত উদযাপনের জন্য বদ্ধপরিবার হইয়া কার্য্য করিতেছিল তাহা দেখিয়া তাহার প্রাণে বিপুল আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু নীলিমার মাতৃত্ব এ কর্ম্মপথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন সন্ধ্যার পর রমেন বাবু একজন মহারাষ্ট্রীয় মহিলাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ইনি দেশে নারীশিক্ষার ধারা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য বিদেশের নারীদের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে পরামর্শ করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। পাঁচবৎসর বিদেশ ভ্রমণের পর তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজ সরকারে নারীশিক্ষা বিভাগের পরিচালিকা নিযুক্তা হইয়াছেন। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিষয়ে এবং পারিবারিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্যকরূপে অবগত হওয়ার জন্য তিনি সম্প্রতি কলিকাতা আগমন করিয়াছেন। এই মহারাষ্ট্রীয় মহিলাটি যেমন নির্ভীক, স্বাধীতা চেতা, তেমনই বিদুষী। বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান গরিমায় ভারতের একটা বরেণ্য জাতি বাঙ্গালী আজ ও যে কেন অবরোধ প্রথাটাকে এমন ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে, এই সমস্যাটা কিছুতেই তিনি সমাধান করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যে জাতির পশ্চাতে একটা বিরাট গৌরবময় ইতিহাস, যে জাতির দেশে অবরোধ চির অপরিচিত ছিল, তাহারা আজ কেন যে এই জাতীয় দুর্ব্বলতাটাকে পোষণ করিয়া আসিতেছে, অবরোধ বিহিন স্বাধীন সমাজে লালিতা পালিতা সুশিক্ষিতা রমাবাই কিছুতেই ইহা বুঝিতে পারিতেন না। তিনি কলিকাতায় আসিয়া রমেন

বাবুর জনৈক মহারাষ্ট্রীয় প্রফেসার বন্ধুর অতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সূত্রেই রমেন বাবুর সহিত অতি সহজে তাহার আলাপ পরিচয় হয়, এবং যথাসময়ে নীলিমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। নীলিমা রমাবাইএর সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠে। নীলিমা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রমাবাইকে তাহারই অতিথি হইয়া থাকিতে অনুরোধ করিল। রমাবাই এর নূতন উদ্দীপনায় নীলিমার কর্ম্ম স্রোত আবার দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইল। তাহার প্রতিষ্ঠিত নারীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় ছয় মাস কার্য্য করিয়া রমাবাই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় নীলিমাকে কিছুদিনের জন্য সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। নীলিমার শ্বাশুড়ী রমাবাই এর গুণে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। অথচ রমেন বাবুর এ বিষয়ে বিশেষ মত ছিল না; কিন্তু জননীর আদেশের উপর দ্বিরুক্তি করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। যথা সময়ে দুই মহিলা বন্ধু—মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙ্গালী নারী প্রতিভা ভারতের বিভিন্ন নারী সমাজ পর্যাবেক্ষণের জন্য বহির্গত হইলেন। নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহারা বরোদা রাজ্যে উপনীত হইলেন; বরোদার শিক্ষা বিভাগ নীলিমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন এবং সেখানকার নারী শিক্ষা বিভাগের পরিচালিকার পদ নীলিমাকে গ্রহণ করিতে হইল।

যথা সময়ে নীলিমার এই সম্মান জনক নূতন পদ গ্রহণের বার্ত্তা রমেন বাবুর কর্ণগোচর হইল। তিনি নীলিমার এই স্বাধীন ভাবটা খুব সহজে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। নীলিমার পাতিব্রত্য সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল। তাঁহার ধারণা হইল যে উদ্ধত; স্বাধীন চেতা নীলিমা তাঁহাকে অবহেলা করিয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেছে।

সুখের সংসার মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার নিকট বিষময় হইয়া উঠিল। অবশ্য বন্ধু মহলে ও কেহ কেহ তাহাকে এই ব্যাপার নিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। সংসারে বিবিধ চরিত্রের লোক বর্ত্তমান। যাহার নিজের মনের বল নাই এবং লোক চরিত্রে সম্বন্ধে যে সম্যক্ জ্ঞানী নহে, তাহাকে ক্ষণিক দুর্ব্বলতা বা উত্তেজনার বশে শান্তিময় সংসার ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া ওলট-পালট করিতে দেখা গিয়াছে।

দুর্ব্বল চিত্ত রমেন বাবু কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। হঠাৎ পুত্রের ভাব বিপর্য্যায় লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধা জননী চিন্তান্বিতা হইলেন; কিন্তু শিক্ষিত, বয়স্ক ও উপযুক্ত পুত্র, জননী তার তীর্থ ভ্রমণ সংকল্পের বিপক্ষে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না। বিশেষতঃ কিছুদিন পূর্ব্বে এক গভীর রজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যেন ধ্যান মগ্ন, দীর্ঘ জটাজুট ধারী এক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি ভক্তি ভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী প্রবর বজ্র গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে যেন বলিলেন, 'বৎসে, মানুষের শেষ লক্ষ্য পরকাল, চেয়ে দেখ কি সুন্দর শান্তিময় দেশ; বিরাট সংসারের কর্ম্ম কোলাহলের অন্তরালে কি বিচিত্র আধ্যাত্ম জগত। বহুপূণ্য ফলে রমেনের মত পুত্র ও নীলিমার মত বধূ লাভ করেছ; তাদের কর্ম্মের পথে কখনো প্রতিবন্ধক হয়ো না; তার পর যেন উজ্জ্বল আলোক মণ্ডিত প্রতিভান্বিত ঋষি প্রবর অন্তর্দ্ধান হইলেন এবং চতুর্দ্দিক জমাট অন্ধকারে ভরিয়া গেল।

এই স্বপ্ন নেহাত অলীক বলিয়া রমেন বাবুর জননীর মনে হয় নাই। তাই তিনি পুত্র ও পুত্রবধূর কোন প্রকার কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইতে ইচ্ছা করেন নাই। রমেন বাবু যথা সময়ে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত গেলেন।

সেইবার ছিল হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা, বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম।

বিরাট জনতা প্রতিধ্বনিত করিয়া শব্দ ভাসিয়া আসিল—রমেন, রমেন, রমেন;—সমবেত জন মণ্ডলী মোহাবিষ্টের মত উর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিল। রমেন বাবু কাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পার্শ্ববর্ত্তী এক অন্ধকার গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

---

(৪)

এদিকে শাশুড়ীর টেলিগ্রাম পাইয়া নীলিমা কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াছে। শাশুড়ীর নিকট বিস্তারিত সংবাদ অবগত হইয়া স্বামীর দুর্ব্বল চিত্তের জন্য নীলিমা মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল।

—"আচ্ছা মা, মানুষ বিদ্যেবুদ্ধি শিখে শিক্ষিত হয় কেন? ক্ষণিক উত্তেজনা, উন্মাদনা বা প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কি শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়? আকস্মিক বিপদে বা কোন প্রকার অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হয়ে স্থির ধীর ও সংযত ভাবে পরিবর্ত্তনের নূতন অবস্থাটাকে গ্রহণ করার শক্তি সঞ্চয় করা কি প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়?"

—"মা, নীলিমা রমেন আমার কোন দিন কোন অবস্থাতে এতটা অধীর হয় নাই। জানি না কোন্ অদৃশ্য শক্তি অলক্ষ্যে থেকে এ নূতন খেলা খেল্‌ছে।"

"মা, সংসারটা যে সব চেয়ে বড় পরীক্ষার স্থল। শত প্রলোভনের মাঝখানে থেকে, শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, কর্ত্তব্যের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান রাখা—আমার মতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যোগী ঋষিরা বনজঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে নির্জ্জন গিরি গহ্বরে থেকে যে সাধনা লাভ করেন, কর্ম্ম কোলাহলময় সংসারের অভ্যন্তরে থেকে মানব যদি সেই সাধনা আয়ত্ব করতে পারে, তবে কি সে অধিক প্রশংসার পাত্র নয়?"

—"মা, নীলিমা, সংসারের প্রলোভন ও প্রতিবন্ধকগুলি, ভগবানের আরাধনার অন্তরায়। নির্জ্জন বনজঙ্গলে বাস করে তাঁকে একাগ্রচিত্তে অহ্বান করতে পারলে তিনি সহজে দেখা দেন।"

—"মা, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। নির্জ্জন বনজঙ্গলেই যদি ভগবানের দর্শন লাভের একমাত্র স্থান হয়, তবে বনের অসংখ্য পশুপক্ষী তাঁর সত্তা উপলব্ধি করতে পারেনি কেন? উপলব্ধি জিনিষটা বাইরের নয়, উপলব্ধি করে 'মন'। মন যার গড়া হয়ে গেছে, ভগবান তার অতি নিকটের জিনিষ। ভগবান ত বাইরে নহেন; ভগবান যে ভেতরে; মা, আপনি আমার পূজনীয়া, আপনার শিক্ষা দীক্ষার আমি আজ কত উন্নত, কিন্তু আপনার উপযুক্ত পুত্র এত দুর্ব্বল!"

—"নীলিমা, কি বলে বোঝাব তোমায়? সবই অদৃষ্টের ফের। নইলে অমন ছেলে কারো নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যেতে পারে? আর সেই যে বলেছি, কি কাল-স্বপ্ন আমি দেখ্লুম, যে সাতদিনের ভেতর সব ওলটপালট হয়ে গেল। সুখের সংসারে অশান্তি ভেসে আস্ল। রমেন তোমার দেশ ভ্রমণ এবং বরোদার রাজসরকারের কার্য্য গ্রহণ যে এতটা অপছন্দ কর্বে, তা পূর্ব্বে বুঝ্তে পার্লে হয়ত এতটা অনর্থ ঘট্ত না, মা নীলিমা।"

—"কিন্তু মা,—আবার বল্ছি, মানুষ শিক্ষিত হয় কেন? অর্থ উপার্জ্জন করা ত শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়; শিক্ষার উদ্দেশ্য অতি মহান্; প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিপলকে যে সকল নূতন ভাব ধারা জগতে আস্ছে, সেই ভাবগুলি বরণ করে নেওয়ার জন্য মানবের সর্ব্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজন। পুরাতনের স্থান নূতন অধিকার করে, শুক্নো পাতা ঝরে যায়, নব মুকুলিত পত্রগুচ্ছ ঝরা পাতার অধিকার নিয়ে জেগে উঠে; এ আইন যে নশ্বর জগতের মামুলী কথা, সেখানে নূতন

কিছু দেখে আঁতকে উঠ্‌লে চল্‌বে কেন, মা? প্রতি মূহূর্ত্তে আমাদের প্রস্তুত থাক্‌তে হবে যে কোন নূতন ভাবকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। নূতনত্ব যে এ নশ্বর জগতের প্রাণ। আমরা চলেছি নক্ষত্র বেগে অনন্তের পথে। আমাদের এ চলা যে কখন শেষ হয়ে যাবে, তা কেউ জানে না; কিন্তু যতদিন না শেষ হচ্ছে, ছুট্‌তে হবে। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে মানুষ যখন আর ছুট্‌তে পারে না, তখনই সে বিশ্রাম নিয়ে আবার নূতন দেহে, নূতন উৎসাহে, নূতন প্রেরণায় ফিরে আসে, সেই অসীমের পথে ছুটবার জন্য। এত বড় জড়পিণ্ড একটা জগত আর অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র পরিবেষ্টিত এই সৌরজগত, সবই যে ছুটেছে উদ্দাম গতিতে; কে জানে মা এর শেষ কোথায়? জগতের সব মানবজাতি ছুটে চলেছে, কেউ আগে বেরিয়ে গেছে, কেউ পেছনে পড়ে আছে। কিন্তু এই ছুটার বিরাম নেই। যে যত বেশী ছুটবে তারই জিত; এত মা খুব সহজ কথা। আর এই যে ছুটার পথ এ, ত চির নূতন; এক ধাপের পর আর এক ধাপ। কিন্তু সেই নূতন দেখে আমাদের চম্‌কে উঠ্‌লে চল্‌বে কেন মা? নূতনই যে জগতের ধর্ম্ম। অসীমের পথে ছুট্‌তে ছুট্‌তে মানবকে কত রকম ভাব ধারার ভেতর দিয়ে যেতে হবে, তার কি কিছু ইয়ত্তা আছে? কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে যে নূতন আসে পুরাতনকে অধিকার চ্যুত করবার জন্য; আর এই অধিকৃত আসন ছেড়ে যাওয়ার সময় পুরাতন দ্বন্দে আহ্বান করে নূতন কে; আর নূতন বিদ্রোহ ঘোষণা করে পুরাতনের সাথে; কিন্তু জয় নূতনের।"

—"নীলিমা, বহুপুণ্য ফলে তোমার মত পুত্রবধূ লাভ করেছি; কিন্তু রমেন যে আমার ভুল বুঝেছে। জানি না তার এ ভুল শোধরাবার সুযোগ কবে আসবে।"

—"মা এ বয়সে অনেক কিছু দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে ; বহু দেশ, বহু মানব সমাজ ও বহুপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। নরেন আপনার কাছে রইল। একমাসের ভেতর যেমন করে হোক্ আপনার পুত্রকে ফিরিয়ে আনব।"

(৫)

পূতসলিলা ভাগীরথীর তীরে রমেন বাবু গৈরিক বসন পরিধান করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। সংসারে যে তার কোন বন্ধন আছে, তেমন আভাষ সেই সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তির দিকে তাকাইলে কেহ সহজে অনুমান করিতে পারে না। কিন্তু তাহার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে প্রবল ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। সংসারের কত বড় একটা বোঝা যে এমন ভাবে স্বার্থপর ও দায়িত্বহীনের মত ছাড়িয়া নির্ব্বিকার চিত্তে এই সুদূর পুণ্য তীর্থে শান্তির আশায় ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহা ভাবিতেই তার সমস্তটা দেহ শিথিল হইয়া আসিল। তখনও সন্ধ্যা বহিয়া যায় নাই। সূর্য্যের শেষ কিরণ রেখাটুকু তখনও অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছিল। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ পশ্চিমাকাশে একখণ্ড মেঘ ভাসিয়া উঠিল ; আর সেই ধূম্র মেঘের আড়াল হইতে ঝঞ্ঝা—তা'র প্রলয় মূর্ত্তি নিয়া নামিয়া আসিল। চারিদিক অন্ধকার ; ঘোর অমাবস্যা রাত্রি প্রচণ্ড ঝড়, মুষল ধারে বৃষ্টিপাত রমেন বাবু ছুটিতে ছুটিতে যাইয়া একখানা বাংলোর সম্মুখে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাংলোর চাকর দাসীরা বারংবার দ্বারে করাঘাত শুনিয়া দ্বার খুলিয়া সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত এক নবীন সন্ন্যাসীকে গৃহে স্থান দিল। রমেন বাবু আর্দ্র বস্ত্রে বসিয়া আছেন দেখিয়া জনৈকা বৃদ্ধা পরিচারিকা

তাহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু সন্ন্যাসী নিজের ভড়ং বজায় রাখিবার জন্য প্রথমটা মোটেই এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই, অথচ শীতে তাহার সমস্ত অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছিল। তখন ঝড় জল অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। পরিচারিকার নিকট জনৈক সন্ন্যাসীর আগমন বার্ত্তা শুনিয়া গৃহকর্ত্রী কৌতুহল বশতঃ সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী ও মেমসাহেবকে দেখিয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রতি মূহুর্ত্তে আশঙ্কা হইতেছিল যে উদ্ধত স্বভাবা এই মেমসাহেব কখন তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইবার জন্য আদেশ দিয়া যাইবেন। শীতে তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল, পথ চলিবার মত ক্ষমতা যেন আর ছিল না। মেমসাহেব কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে এদিক সেদিক ঘুরিয়া একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া বাংলোর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে কাপড় জামা ও কম্বল লইয়া পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া রমেন বাবুকে উহা পরিধান করিতে দিল। রমেন বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া উহা পরিধান করিলেন এবং কম্বল গায়ে দিয়া সদ্য রচিত দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় বিশ্রাম করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। মেম সাহেবের এই অযাচিত আদর যত্নে তিনি পরম আপ্যায়িত হইলেন এবং মনে মনে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তারপর জনৈক পরিচারিকা কিছু ফল মূল ও দুধ লইয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। সন্ন্যাসী যথাসম্ভব আচার নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া আহারাদি সমাপন করিলেন, এবং জনৈকা বৃদ্ধা পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, যে এই মেমসাহেব সম্প্রতি কলিকাতা হইতে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়াছেন,

এককজন সাহেব ও ওঁর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি ৩।৪ দিন যাবৎ অন্যত্র কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন ; মেমসাহেব খুব সঙ্গতি সম্পন্না এবং লোক পরম্পরায় তাহারা যতদূর জানিতে পারিয়াছে, যে মেমসাহেবের পূর্ব্ব পুরুষেরা বাঙ্গালী ছিলেন ; কিন্তু মেমসাহেব এখন খাঁটিমেমসাহেব রমেন বাবু ও মেমসাহেবের চাল চলন সামান্য একটু দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে ইনি এংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা। কিন্তু এই পরদেশী রমণী তাহার মত একজন পথের ভিখারীকে কেন যে এরূপ অযাচিত অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ রমেন বাবু স্থির করিতে পারেন নাই। পরদিবস প্রভাত কালে শয্যাত্যাগ করিয়া রমেন বাবু স্বীয় পরিত্যক্ত গৈরিক বসন পরিধান করিলেন এবং প্রস্থানের পূর্ব্বে মেমসাহেবকে যথোচিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার দর্শন প্রার্থনা জানাইলেন। উদ্ধত স্বভাবা মেমসাহেব বলিয়া পাঠাইলেন যে রাস্তার ভিখারীর সঙ্গে যখন তখন সাক্ষাৎ করিবার অবসর তার নাই ; বৈকালে ৫ টার পর দেখা হইতে পারে ; মেম সাহেবের এই রূঢ় আচরণ রমেন বাবু খুব সহজেই বরদাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন ; কারণ তিনি মেমসাহেবের নিকট হইতে তাঁহার অসহায় অবস্থায় যতটুকু অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, তার চেয়ে বেশী কিছু তিনি প্রত্যাশা করিতে পারেন না। কিন্তু সেই উপকারের জন্য একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ ও যে তিনি দিতে চাহিলেন না, ইহা ভাবিতে তাহার মনে একটু ক্ষুদ্র আঘাত বাজিয়া উঠিল। আবার তাহার মনে হইল, তাইত মেমসাহেবেরই বা অপরাধ কি ? তিনি আর জানেন না যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত, হাল সভ্যতার চাল চলন দুরস্ত ; তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন, আমি কোন পশ্চিম অঞ্চলের ভিখারী সন্ন্যাসী অসহায়। পথিকের প্রতি যতটুকু অনুকম্পা

প্রদর্শন ও সেবা যত্ন করা নারীর কর্তব্য, ততটুকু তিনি করিয়াছেন। ভিখারীর ধন্যবাদ প্রার্থিনী হয়ত তিনি নহেন ; ঐশ্বর্য্য গর্কে গর্কিতা ধনীর দুহিতা তিনি।—

এইরূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে সন্ন্যাসী রমেন বাবু বাংলো পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরিচিত সন্ন্যাসীদের আড্ডার উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। এদিকে মেম সাহেবের ইঙ্গিতে তাহার এক বালক ভৃত্য সন্ন্যাসীর পশ্চাদনুসরণ করিল। রমেন বাবু যখন সন্ন্যাসীদের আড্ডায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তখন সেই বালক বাংলোতে ফিরিয়া আসিল এবং মেমসাহেবকে যে সকল সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিতে লাগিল। মেমসাহেব একটু হাসিলেন মাত্র।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার সেই সন্ন্যাসী বাংলোর দ্বারে দণ্ডায়মান। বালক ভৃত্য আসিয়া তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল। সন্ন্যাসী মেমসাহেবের দর্শন প্রার্থনা করা মাত্র বালক তাহাকে বাংলোর ভিতরে লইয়া গেল। এক সুরম্য, সুসজ্জিত কক্ষে সন্ন্যাসীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বালক প্রস্থান করিল। প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরও যখন আর কাহারও কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, তখন রমেন বাবু বিরক্ত হইয়া বাহির হইতে যাইতেছেন, এমন সময় মেমসাহেব তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি মেমসাহেবকে পূর্ব্বদিনের উপকারের জন্য ইংরেজীতে যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মেমসাহেব প্রত্যুত্তরে তাহাকে শুধু বলিলেন, "মনে থাকে যেন ঠাকুর, এ উপকারের প্রত্যুপকার করতে হবে একদিন।" রমেন তাহাকে আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দ্রুতপদে বংলো হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মেম সাহেবের কণ্ঠস্বর যেন ক্রমেই তাঁহার পরিচিত বলিয়া ধারণা হইতে লাগিল ; রাত্রির অন্ধকারে ও গাছের ছায়ায় মেম

সাহেবের মুখ দেখিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই কিন্তু সেই স্বর—যেন কেবলই তাহার কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর আশ্রমে যোগী, ত্যাগী সাজিয়া এক অজানিত মেম সাহেবের রূপ ও স্বর চিন্তা করা যে কতটা অসঙ্গত তাহা তাঁর অজানা ছিল না। তিনদিন এইভাবে কাটাইয়া একদিন রাত্রিতে রমেন বাবু সন্ন্যাসীর অড্ডা পরিত্যাগ করিয়া ষ্টেসনের দিকে যাইতেছেন, এমন সময় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। পুলিশের ইনস্পেক্টর তাঁহাকে ফেরারী আসামী বলিয়া একখানা পরোয়ানা বাহির করিয়া দেখাইলেন এবং সম্প্রতি হরিদ্বারে নবাগত মেম সাহেব—মিসেস্ কুপারের বাড়ীতে চৌর্য্য অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ দর্শাইলেন। রমেন বাবু মহা বিরক্ত হইয়া পুলিশের কনেষ্টবলকে এক ঘুষি বসাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহারা ধৃত আসামীর এই অত্যাচারের বিশেষ কোন প্রতিকার না করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। গভীর নিশীথে সন্ন্যাসী, ইন্স্পেক্টর ও কনেষ্টবল পথ বহিয়া চলিয়াছে; কোন জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না; সমস্ত নগরী তখন সুখ নিদ্রায় শায়িত। পথ চলিতে চলিতে তাহারা সেই মেম সাহেবের গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলে, দ্বারবান দ্বার খুলিয়া দিল। ইনস্পেক্টর বাবু সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'রাত্রি প্রভাত হইলে এই স্থানে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে এবং মেম সাহেবের এজলাসে তাহার বিচার।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। মেম সাহেবের বাংলোর ভিতর হইতে সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি রমেন বাবুর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। সে স্বর যেন তার চিরপরিচিত, চির আদৃত বলিয়া মনে হইল; তিনি তন্ময়চিত্তে শুনিতেছিলেন আর মাঝে মাঝে কত কি ভাবিতেছিলেন। এই বাংলোতে সাতদিন পূর্ব্বে ঝড় জলে ক্লিষ্ট তিনি, আশ্রয় গ্রহণ

করিয়াছিলেন অসহায় পথিক—রূপে ; আর গৃহ স্বামিনী পরম যত্নে পরোক্ষভাবে তাঁর সেবা যত্ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু আজ সেই গৃহে, সেই সুসজ্জিত অট্টালিকার দ্বারে তিনি বন্দী ; মুক্তি ছিল তাঁর পণ ; শতবন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির আশায় তাঁর আগমন এইসুদূর তীর্থভূমে ; আর বিধির বিড়ম্বনায় মুক্তি পথের পথিক সেই সন্ন্যাসী আজ রাজদ্বারে কলঙ্কিত, চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী, বন্দী।

এমন সময় হঠাৎ সে গৃহ আলোকিত করিয়া প্রবেশ করিলেন গৃহ স্বামিনী, মেম সাহেব ; সাড়ী জামা পরিধান করিয়া ; রমেন বাবু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন সেই সুন্দর গরীয়সী নীলিমার স্নিগ্ধ মূর্ত্তির দিকে। তার সমস্ত বিদ্যা ও জ্ঞানের অহঙ্কার সেই নারীর উদ্দেশ্যে যেন অজ্ঞাতসারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। নীলিমা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মেম সাহেবের নিকট তুমি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ; মনে আছে সেই কথা"।

—"খুব মনে আছে, নীলিমা ; কিন্তু তুমি এখানে—"

—"হাঁ, আমি এখানে, আশ্চর্য্য হচ্ছ, সন্ন্যাসী ?"

—"না, আশ্চর্য্য কিসের ? তোমরা সব পার।"

"আর তোমরা ? মুক্তির আশায় তুমি স্বার্থপর, এসেছিলে এই সুদূর প্রান্তরে, পর্ব্বত গহ্বরে ! কিন্তু মুক্তি এখানে নয় ! মুক্তি ভেতরে ;—মুক্তি,—ঐ—চেয়ে দেখ, উপরে—সুদূর, সুনীল, উদার আকাশে,—বিশ্বপিতার দরবারে—। দরিদ্রের কুটিরে, গুহায় গহ্বরে,—পর্ব্বত কান্তারে, বন বনান্তরে, রাজ অট্টালিকায়,—বিলাসীর বিলাস ভবনে, সর্ব্বত্র তাঁর অবাধ গতি ! যেখানে বসে প্রাণ খুলে তাঁকে ডাকবে, তিনি সেখানেই। তাঁর কাছে হৃদয়ের ব্যর্থতা, অপূর্ণতা

জানাবার জন্য পর্ব্বত গহ্বরে ছুটে আস্তে হয় না, গৈরিক বসন পরিধান করে ভস্ম মেখে সন্ন্যাসী না সাজ্‌লেও চল্‌তে পারে। যোগী, ঋষি যারা আশৈশব এ পথে বেরিয়ে এসেছেন, তাদের কথা স্বতন্ত্র; সংসারে তাদের কোন বন্ধন নেই; সমাজের প্রতি তাদের কোন কর্ত্তব্য নেই। এই শ্রেণীর বেশীর ভাগ সন্ন্যাসী আজন্ম আপন মুক্তির জন্য কঠোর সাধনা করে থাকেন। সমাজের কোন উপকারে হয়ত তারা আসেন না। বিশ্ব পিতার সন্তান মানুষ হয়ে জন্মেছি; অসহায় অজ্ঞান—ভাই বোন্‌দের সেবা যত্ন করা, জ্ঞান বিতরণ করা, সংসারে থেকে তাদের মুক্তির সন্ধান দেওয়া, মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"

—"হঁা নীলিমা, আমারও কি—সেই পণই ছিল না?"

—"তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তোমার ভণ্ডামী।"

—"না, নীলিমা, তুমি ভুল বুঝেছ আমাকে। স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হয়ে আমি এই সুদূর দেশে পালিয়ে আসিনি। আমি এসেছিলাম তোমাদের সকলের মুক্তির জন্য। আর, দেখ, সব সন্ন্যাসীই কি আপন মুক্তি নিয়ে ব্যস্ত; সমাজের আদর্শ স্থানীয় হয়ে, গুরু হয়েও ত অনেক সন্ন্যাসী সংসারের লোককে মুক্তির সন্ধান বলে দেন।"

"হঁা, তা বটে, কিন্তু সমাজের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসী অতি বিরল। তা, যা হোক্, মেম সাহেবের—নিকট তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তার উপকার করবে; আজ তার উত্তম সুযোগ উপস্থিত। এই মুহূর্ত্তে আমাকে সঙ্গে করে তুমি কল্‌কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন কর; তা' হলেই মেম সাহেব যথেষ্ট উপকৃত—হবেন।"

—"মেম সাহেবের আদেশ আমি শির পেতে গ্রহণ কর্‌লুম্। কিন্তু প্রবাস হতে শেষ বিদায়ের পূর্ব্বে আমি মেম সাহেবের সাথে একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে পারি কি?"

—"হাঁ খুব পার; কিন্তু ভিখারীর সাথে ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বিদেশিনী মেম সাহেব সাক্ষাৎ করতে কুণ্ঠিতা। যদি, বাস্তবিক সত্যিকার মেম সাহেবের দর্শনাভিলাষী হও, তবে ঐ পাশের ঘরে যেয়ে সাহেব সেজে এসো।"

রমেন বাবু পাশের ঘরে যাইয়া দেখিলেন তাঁহারই নিজের জামা, জুতা, প্যাণ্ট কোট হ্যাট্ ও টয়লেটের যাবতীয় সামগ্রী সুসজ্জিত। তিনি ক্ষৌর কার্য্য সমাধান করিয়া স্নান করিলেন ও পোষাক পরিধান করিয়া সাহেব সাজিয়া বাহির হইয়া দেখিলেন, বাংলোর দ্বারে গাড়ী সুসজ্জিত। নীলিমা মেম সাহেব খাটি মেম সাহেব সাজিয়া হাসিতে হাসিতে রমেন বাবুর হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং সেই দিন দ্বিপ্রহরের ট্রেণেই তাঁহারা কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন।

যে দিন তাঁরা কলিকাতা পৌছিলেন, সেদিন ছিল শারদোৎসবের প্রথম রজনী।